# সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত

# সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত

শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্ত্তী

ডি.এম.লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৬

উৎসগ

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু।

সেই উজ্জ্বল মুহূর্তটি আমার মনে পড়ছে। তোমার উদয় হল আমার চোখের সামনে যেন ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন।

যেন পবিত্রতমা মায়াবিনী দেবদূতী।

নৈরাশ্যভরা দুঃখের বেদনার ভিতর কোলাহল-মুখর জীবনের ব্যস্ততার ভিতর আমি শুনলেম তোমার সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি, স্বপ্নে দেখলেম তোমার স্নেহময় মুখ।

## এই লেখকের কথা

রম্যাণি বীক্ষ্য : দক্ষিণ ভারত পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য : রাজস্থান পর্ব

রূপম্ ?

মধুরাংশ্চ

একটি আশ্বাস

মণিপদ্ম

( ১ )
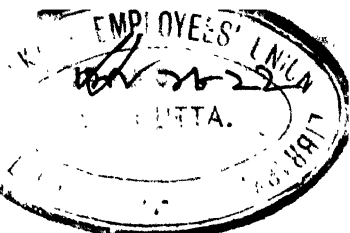
সেই উজ্জ্বল মুহূর্তটি আমার মনে পড়ছে। তোমারি উদয় হল আমার চোখের সামনে, যেন ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন, যেন পবিত্রতমা মায়াবিনী দেবদূতী। স্মৃতনিমা এক গাল হেসে বলল: সেটা কি তোমার উজ্জ্বল মুহূর্ত বিশুদা?

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট হলেও খোঁচাটুকু নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে বললুম: তাকে উজ্জ্বল মুহূর্ত বলার সৌভাগ্য নিয়ে যারা জন্মেছে, ইতিমধ্যেই তারা গম্ভীর হয়ে ওঠেনি কি!

নিবেদিতা আরক্ত হল, আর তার সঙ্গে নির্মাল্যও যে কিছু কঠিন হল তা কারও চোখে গোপন রইল না। ডাক্তার শোলাপুরকার হাসতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু স্মৃতনিমা হাসল। নিজের সাফল্য লক্ষ্য করে নিজেও হাসলুম অপর্যাপ্ত ভাবে।

খানিকক্ষণ আগে যে অপ্রসন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, এই তরল পরিহাসে তা শেষ হয়ে গেল।

বোনের বিয়েতে নির্মাল্য যাদের শহর থেকে টেনে এনেছিল, একে একে তারা সবাই ফিরে চলেছে। যারা আগে ফিরে গেছে এবং যারা পরে যাবে, তাদের আমার প্রয়োজন নেই। আজ যারা এই ট্রেনের কামরার ভেতর একসঙ্গে ফিরে চলেছি, কেবল তাদের নিয়েই এ গল্প চলতে পারে।

গাড়িতে উঠে নিবেদিতা নিঃশব্দে একটা কোণায় বসেছিল। বিচিত্র বিভিন্ন যন্ত্রে নানা বাদ্য শেষ হবার পর গাড়ি এক পা দু' পা

করে চলতে শুরু হতেই নিবেদিতা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলে ফেলেছিল ঃ বাঁচা গেল।

কথাটা নিজের কানে যেতেই তার অন্যমনস্কতাও গেল ভেঙে। নির্মাল্য বসেছিল ঠিক তার সামনের বেঞ্চে। সহরবাসী অতিথিদের সর্বপ্রকার সুবিধা বিধানে যার বিশ্রামের অবকাশ ছিল না, সেই নির্মাল্যকে তার এই উক্তিটা কী ভাবে আঘাত করবে ভাবতেই নিবেদিতার শিক্ষিত অন্তর লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

আহত নির্মাল্য বলল ঃ আমাদের দেশটা বুঝি আপনার ভালো লাগেনি ?

ভালো না লাগার হেতু ছিল। নির্মাল্যের পিতা বৃদ্ধ জমিদার কৃষ্ণদয়াল বাবুর অতি আত্মীয়তা তার আদৌ পছন্দ হয়নি। পুত্রবধূ-রূপে ঘরে আনবার একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল তাঁর মাতৃসম্বোধনে। তার ওপর বৃদ্ধের বাঙালী আশীর্বাদটুকু এখনও সে ভুলতে পারেনি। 'সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে' যে দেশের সংস্কার, সে দেশের নব্য মেয়েদের বাগদত্তা হবার অশুচিতা বাঁচানো একটা সমস্যা।

তাই এ প্রশ্নের জবাব দিতে হল তার বৌদি সুতনিমাকে। বলল ঃ কিন্তু আপনাদের আমার খুবই ভাল লেগেছে। মনে হচ্ছিল, অনেকদিন পরে আবার আত্মীয়েরা সব একত্র হয়েছি।

সুতনিমার কণ্ঠে একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা ধরা পড়ল।

নির্মাল্য একটা উত্তরের প্রত্যাশা করেছিল নিবেদিতার কাছ থেকে। শোলাপুরের মহারাষ্ট্রী মেয়ে নিবেদিতা আবাল্য শিক্ষা পেয়েছে শান্তিনিকেতনে। বেশে বাসে আচারে ব্যবহারে বাঙালীপনা এমন নিখুঁত আয়ত্ত করেছে যে নামের সবটুকু না জানলে

ভ্রমে পড়তেই হবে। মার্জিত রুচির এই চঞ্চল মেয়েটি তখনও তার অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ডাক্তার শোলাপুরকার বাঙলা বোঝেন, কিন্তু বলেন না। বোধ হয় বাঙালী স্ত্রীর কাছে শেখা ভাষার অপটুতা সম্বন্ধে একটু বেশি সচেতন, তাই গুরুতর ব্যাপারে ইংরেজি ভাষারই শরণ নেন। এবারেও স্ত্রীর মনের উত্তরটা দিলেন সরল ইংরেজিতে ঃ দেশটাকেও তাই আর খারাপ বলা চলে না তনু, এই দেশেই তো আত্মীয়দের খুঁজে পাওয়া গেল! কী বলেন বিশ্বপতিবাবু!

শেষ কথা কটি বললেন বাঙলায়।

আমি তখন রুশ দেশের একখানি রূপকথা নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম। বইখানি পুস্কিনের রাসলান-ই-লুড্‌মিলা। রাসলান লুডমিলাকে বিয়ে করেছে। আহারের পর লুডমিলা তার স্বামীর সঙ্গে অগ্রসর হতেই সমস্ত আকাশ কালো করে ঝড় উঠল। মেঘের ডাকের সঙ্গে তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ আকাশটাকে যেন চিরে ফেলতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে যখন ঝড় থামল, লুডমিলাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। বইএর ভাষা ও বলার ভঙ্গী এমন সহজ যে মাঝে মাঝে মনে হয় এই প্রাঞ্জলতার জন্যেই পুস্কিনের সমস্ত রচনা বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনুদিত হতে পারেনি। বই থেকে চোখ না তুলেই ডাক্তারের জবাব দিলুম ঃ নিতা ঠিকই বলেছে। অনেকক্ষণের দাঁড়ানো গাড়ি হঠাৎ চলতে শুরু করলে সকলেরই প্রাণ বাঁচে নাকি?

আমার উত্তর শুনে নিতাই উৎফুল্ল হল সকলের চেয়ে বেশি। তনুর কানের কাছে মুখ এনে কী একটা মন্তব্য করল। প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল দেখাল তার সুশ্রী মুখখানা।

নির্মাল্য যেন একটু ক্ষুব্ধ হল। অভিমানের সুরে বলল ঃ একাকে সবাইকে বঞ্চিত করা আপনার ভারি অন্যায়।

তনু হেসে ফেলল, বলল ঃ ওর কথা এমন কিছুই গোপন নয়। বলছিল—

প্রবল ভাবে আপত্তি জানাল নিতা ঃ ভালো হচ্ছে না কিন্তু বৌদি!

বৌদির মুখের ওপর একটা হাত চেপে ধরতে যাচ্ছিল। সেটা সরিয়ে দিয়ে তনু বলল ঃ বলছিল, বিশুদা নাকি অদ্ভুত মানুষ। একসঙ্গে বইও পড়ে, গল্পেও কান রাখে।

লজ্জিতভাবে নিতা বলল ঃ নিশ্চয়ই বই এ আপনার মন ছিল না, থাকলে আমাদের বাজে কথা আপনার কানে যেত না কখখনো।

এবারে মুখ তুলতে হল, বললুম ঃ এটুকু বুঝলে না নিতা, মেয়েদের উল বোনার মতো মোটা মোটা বইএর পাতায় চোখ রেখে পুরুষদের গল্প শোনার অভ্যেস এ যুগের একটা ফ্যাসান। তার ওপর এই নব বিদেশী বই, এসব পড়া কি আমার কর্ম!

দেখি।

বলে হাত বাড়াল নিতা।

এই দেখো না।

সামনে ঝুঁকে বইখানা এগিয়ে দিলুম।

বই হাতে নিয়ে নিতা খানকয়েক পাতা ওল্টাল এলোমেলো ভাবে। তারপর অনাসক্ত ভাবে বলল : পড়তে পারেন না তো কেনেন কেন?

তৎপরতার সঙ্গে তার উত্তর দিলুম: কিনিনি তো। এখানা লাইব্রেরীর বই।

আমার ছদ্ম গাম্ভীর্যটুকু উপভোগ করে তনু বলল: তুমিও যেমন নিতা, তাই বিশুদার কথা বিশ্বাস করচ! নানা দেশের ভাষা পড়তে জানেন স্বীকার করলে পাছে ওঁর সম্বন্ধে একটা বড় রকমের কিছু ভেবে বস, তাই লুকোচ্ছেন।

পশ্চিমের দিগন্তে শ্যামল বনরাজির মাথা পর্যন্ত নেমে এসে ক্লান্ত সূর্য তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার তীব্র ঔজ্জ্বল্য এখন স্নিগ্ধ রক্তিমতায় রূপান্তরিত হয়েছে। বিচিত্র বর্ণবিভার বিহ্বল মীড় লেগেছে অপরাহ্নের আকাশে। সূর্যের নিচেটা ক্রমেই ক্ষয় হতে লাগল এবং একটা অন্যমনস্ক মুহূর্তে ঝুপ করে নেমে গেল দিগন্তের নিচে।

অপরিসীম মনোযোগে তনুর কথা শুনছিল নিতা, বলল: আশ্চর্য তো!

নির্মাল্যের চোখ ছিল অস্ত-আকাশের অজস্র রঙের অকৃপণ অপচয়ের দিকে। নিতার কথার উত্তরে বলল: আশ্চর্য কিছুই নয়, এটা রিফ্র্যাক্সনের জন্যে।

তারপর অঙ্কের ক্লাসে রিফ্র্যাক্সন ও প্যারালাক্স সম্বন্ধে যা কিছু মুখস্থ করেছিল ছাত্র জীবনে: তার সরল তর্জমা শেষ করে বলল: এরই জন্যে মনে হয়, সূর্যের তলাটা বুঝি ক্ষয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক কারণটুকু জানা না থাকলে আশ্চর্য লাগে বৈকি!

হঠাৎ তার এই বিরাট বক্তৃতার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে খানিকটা বিচলিত হল সবাই। প্রশ্নের দৃষ্টি মেলে ধরল তার মুখের ওপর। আমি না হেসে থাকতে পারলুম না। বললুম: ব্যাপারটা অত্যন্ত

সরল। সূর্য এই মাত্র ডুবল। নির্মাল্যবাবুর চোখ ছিল সেই দিকে। কাজেই নিতার আশ্চর্য কথাটা তিনি সূর্যাস্তের বিশেষণ বলে ভাবলেন। তাঁর মনটা যদি আমাদের কথায় থাকত, তাহলে স্পষ্টই বুঝতেন যে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন নিতাকে মুগ্ধ করেনি, তার উক্তিটা তনুর নিজস্ব আবিষ্কারের ওপর গভীর বিস্ময় প্রকাশ।

নির্মাল্য লজ্জা পেল অপরিমিত। বলল: সত্যিই আমি অন্যমনস্ক ছিলুম।

খানিকক্ষণ নীরবে কাটল। ডাক্তার শোলাপুরকার তাঁর ব্যাগ থেকে একখানা বই বার করবার মতলব আঁটছিলেন। তনুর কাছে ধমক খেয়ে নিরস্ত হলেন। শুধু আমার হাতেই একখানা বই। কিন্তু পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করেই দেখলুম যে আমাকেও ধমক দেবার দুঃসাহস একজন রাখে, সে নিতা। বলল: কি যে ছাই সারাক্ষণ বই নিয়ে থাকতে ভালবাসেন! তার চেয়ে একটা কবিতা বাঙলা করেও শোনানো চলে। শুনে আমরাও ধন্য হতে পারি।

বইএর শেষ দিকে কয়েকটি কবিতা ছিল। বোধ হয় তা সে দেখেছে। বললুম: তাই শোনাচ্ছি।

প্রথম যে কবিতাটি নজরে পড়ল, তার বাঙলা তর্জমা কতকটা এই রকম।

সেই উজ্জ্বল মুহূর্তটি আমার মনে পড়চে।
তোমার উদয় হল আমার চোখের সামনে
যেন ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন
যেন পবিত্রতমা মায়াবিনী দেবদূতী।

এক গাল হেসে তনু বলল: সেটা কি তোমার উজ্জ্বল মুহূর্ত বিশুদা?

বললুম : তাকে উজ্জ্বল মুহূর্ত বলার সৌভাগ্য নিয়ে যারা জন্মেছে, ইতিমধ্যেই তারা গম্ভীর হয়ে ওঠেনি কি!

আমার অপর্যাপ্ত হাসির উত্তরে নিতা বলল : থামলেন কেন, পড়ুন না ছাই!

পরের শ্লোকটিও পড়লুম।—

নৈরাশ্য ভরা দুঃখের বেদনার ভিতর
কোলাহল মুখর জীবনের ব্যস্ততার ভিতর
আমি শুনলুম তোমার কণ্ঠ সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি ;
স্বপ্নে দেখলুম তোমার স্নেহময় মুখ।

একটা বড় ষ্টেশনে ট্রেন থামছিল। নির্মাল্য লাফিয়ে নেমে গেল এবং খানিকক্ষণ পরেই উপাহার গৃহের একজন লোকের হাতে বিস্কুট পেষ্ট্রি প্রভৃতি কিছু শুকনো খাদ্য এগিয়ে দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল।

খাবার ইচ্ছে ছিল না কারুরই। তনু ও নিতা দু পেয়ালা চা নিয়েই ক্ষান্ত হল। নির্মাল্য ও ডাক্তার শোলাপুরকার একটি কেক ও একখানা বিস্কুট ভাগ করে নিলেন। কাজেই অবশিষ্ট সব কিছুই পড়ল আমার ভাগে। নিতা বলল : খেয়ে নিন বিশ্বপতিবাবু, লজ্জা করে ফেলবেন না। দেহটা তো সবাই দেখতে পাচ্চি, পাতে পড়ে থাকলেই লজ্জা করচেন ভেবে আশ্চর্য হব।

প্লেট দুখানা টেনে নিতে নিতে বললুম : লজ্জা তো পুরুষ মানুষের জন্য নয় নিতা, 'ওটা তোমাদের আর ঐ বড়লোকদের এক চেটে।

বলে নির্মাল্য ও ডাক্তার শোলাপুরকারকে দেখিয়ে দিলুম।

প্রচণ্ডবেগে হেসে উঠলেন ডাক্তার। বললেন : বড়লোকরা কি পুরুষ মানুষ নয়!

তনু বলল: নিজের টাকার থলিটা বুঝি কারও চেয়ে ছোট তোমার।

বললুম: ভুল হল তনু, বাবা মোটা টাকা মাইনে পান বটে, কিন্তু কানা কড়িটিও রেখে যাবেন না ছেলের জন্যে। তিনি চোখ বুঁজলেই আমায় পথে এসে দাঁড়াতে হবে।

ডাক্তার বললেন: সেকি, শুনেচি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে তাঁর টাকার অঙ্ক ছ ঘরের সংখ্যা ছেড়ে উঠেচে সাতের ঘরে।

হেসে বললুম: কী করে তা হবে! বাবা ছাড়া আমার নিজের বলতে যেমন আর কেউ নেই, দূর সম্পর্কের মাসি পিসিরাও তেমনি আমাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ করে ক্রমেই বাহুল্য হয়ে উঠচেন। এখনো বাড়ি গেলে আমায় ছাদে কিম্বা বারান্দায় ঘুমতে হয়। এ সবের ওপর আছে পালপার্বণ নিত্য দেবসেবা। কী থাকে তাঁর জমাবার মতো!

কথাটা বুঝি কারও বিশ্বাস হল না। তাই বলতে হল: দেখচেন না আমাকে, কোনো রকমে তনুরক্ষা। সৌখীনতা কোন দিনই করতে পেলুম না। খদ্দরের মোটা কাপড় আর এই ছাগলের চামড়ার কটকী চটি জুতো।

নিত্য তার পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। হাসতে হাসতে বলল: কোনরকমে তনু রক্ষাই বটে।

তনু বলল: জামা কাপড়ের কথা বলচ? ও চেহারায় আর গরদ শাটিনের দরকার হয় না।

প্লেটে তখনও প্রচুর খাদ্য ছিল। বললুম: নির্মাল্য বাবু, সবগুলো শেষ করতে হলে আরও কিছু চা চাই যে!

নির্মাল্যের আদেশে আরও চা এল। কথা ছেড়ে আহারে মন দিলুম। ট্রেন যখন ছাড়ল, তখনও খাওয়া মেটেনি। জানালার বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়েই বেয়ারারা বিদায় নিল।

( ২ )

দিন কয়েক পরে কলেজ স্কোয়ার মেসে নিজের ঘরে বসে পড়াশুনো করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টা পরীক্ষা পাস করে শুধু একজন বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি মাত্র। বর্তমান পাঁচসালায় সরকার এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হননি, কোন্ পাঁচসালায় হবেন তা জানা নেই। স্বাধীন দেশে প্ল্যানিং কমিশন বসেছে। প্রথম দফায় মাঠে সোনা ফলবে, তারপর বসবে কলকারখানা। যারা লাঙ্গল ধরতে পারবে না, হাতুড়িও না, ডিগ্রীর ভার নিয়ে তারা অন্য পাঁচসালার স্বপ্ন দেখবে। ভিখারীদের ভাগ্য ফিরবে সকলের পরে।

কোন কাজ না পেয়েও বেকারের খাতায় নাম লেখাইনি। নিজের ভদ্র পরিচয়টুকু বজায় রাখবার জন্য গবেষণা শুরু করেছি। নানা দেশী ও বিদেশী বই থেকে উপাদান আহরণ ও সংকলন করে ডক্টরেট হবার সংকল্প ঘোষণা করেছি। পিতা জীবিত আছেন। অবসর গ্রহণ না করা পর্যন্ত ছেলের ব্যয়ভার বহন করতে পারবেন, এইটুকুই আশ্বাস।

সিঁদুর রঞ্জিত রঞ্জনলাল ওদিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দেবেশবাবু তখন উঠোনের কলে অঞ্জলি ভরে জল পান করছিলেন। রঞ্জন তার কাছে গিয়ে বলল: দেবেশবাবুর যে জল খাওয়া আর শেষ হচ্ছে না!

ভদ্রলোক চা খান না, বলেন গুরুদেবের নিষেধ। সকালে বিকেলে খাবারও খান না, ওতে নাকি অম্বল হয়। খান কলে মুখ দিয়ে 'এক কল জল।' তারপর এক ছাত্রী পড়াতে যান। এই পড়াতে যাওয়া নিয়ে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ তাঁকে নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়। ভদ্রলোক ভালো মানুষ, তাতে কারও সন্দেহ নেই। মোটা থপ থপে চেহারা। রঙ এত ময়লা যে কাপড়ের ফুটো দিয়ে গা দেখা গেলে লোকে কালি পড়েছে ভাবে।

রঞ্জনের কথার জবাব দেবার তাঁর অবসর নেই। নিবিষ্ট চিত্তে মিনিট তিনেক জল পানের পর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। চিরদিনের অভ্যাসমত স্বগতোক্তি করলেনঃ এক কল জল খাওয়া গেল।

একদা রঞ্জনলাল কেমিষ্ট্রিতে মাষ্টার্স ডিগ্রী নিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য তাকে সাহায্য করল না। বহুদিনের বহু চেষ্টাতেও যখন কোনও কাজের কাজ জুটল না, তখন এই সিঁদূর তৈরিতে মনোনিবেশ করল। আরও তৈরি করে নানা জিনিষ। তার ভেতর টুথ পাউডার আর ফেস পাউডারও বাজারে কিছু কাটে। সিঁদূর তাকে খেতে দেয়, আর আনন্দ দেয় দেবেশবাবু। বলল ঃ আপনার ছাত্রী কেমন আছে দেবেশ বাবু ?

সরল প্রশ্নকে বাঁকা অর্থে গ্রহণ করা দেবেশবাবুর প্রকৃতি নয়। রঞ্জনের প্রশ্নকে সহজভাবেই গ্রহণ করলেন, কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বললেনঃ ভালো আছে।

রঞ্জন হাসল তাঁর উত্তর শুনে।

ঘর থেকে জামা গায়ে দিয়ে দেবেশ বাবু বার হচ্ছিলেন। কলের নীচে হাত কচলাতে কচলাতে রঞ্জন বলল: দেবেশ বাবু যে আজ এরই মধ্যে বেরুচ্চেন!

জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে দেবেশবাবু উত্তর দিলেন: একটু কাজ ছিল।

একটা কটাক্ষ করে রঞ্জন বলল: ছাত্রীর নেমন্তন্ন বুঝি?

পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়ালেন দেবেশবাবু, বললেন: কী করে জানলেন আপনি?

রঞ্জন ঠাট্টা করেছিল মাত্র, পুলকিত হল তাঁর উত্তর শুনে। হেসে বলল: তা চা-টা খেয়ে সিনমায় যেতে হবে তো?

দেবেশবাবু এবারে যেন অভিভূত হলেন। বললেন: কী আশ্চর্য ক্ষমতা আপনার মশাই!

গাম্ভীর্যে গদ গদ হল রঞ্জন, বলল: এতে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই দেবেশবাবু, এ সবই আমার শ্রীগুরুদেবের কৃপা! সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তিনি।

বলে যুক্তকর কপালে ঠেকাল।

সাধু সন্ন্যাসীর ওপর যে দেবেশবাবুর ভক্তি একথা আমরা সবাই জানি। রঞ্জন হয়তো ভেবেছিল, গুরুদেবের নামে তিনি দাঁড়িয়ে যাবেন। কিন্তু দাঁড়ালেন না। আজ তাঁর বড় তাড়া। শুধু শূন্যে একটা নমস্কার করে বললেন: ফিরে এসে আপনার গুরুদেবের গল্প শুনব।

বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

রঞ্জন হাসতে হাসতে এল আমার ঘরে, বলল : চায়ের কতদূর বিশ্বপতি ?

বললুম : জল ফুটল বলে !

সকাল বিকেলের চা-টা ভদ্রলোক আমার ওপরেই চালিয়ে আসছেন। তবে একেবারে মুফতে নয়। পরিশ্রম করে তৈরি করে আমায় ভাগ দিয়ে খান ! আমার ঝঞ্ঝাট খানিকটা বাঁচে বলে এই ব্যয়টা গায়ে লাগে না। আজও রঞ্জন পেয়ালা প্লেটগুলো তুলে নিয়ে ধুয়ে আনবার জন্য বেরিয়ে গেল।

বিশ্বপতিবাবু কি এই ঘরে থাকেন ?

বলতে বলতে বিলিতি পোষাকে ডাক্তার শোলাপুরকার ঘরে এলেন।

আরে, ডাক্তার সাহেব যে ভেতরে আসুন !

ভেতরে আসব, কিন্তু বসব না। বাইরে গাড়িতে মেয়েরা অপেক্ষা করচেন, আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এলুম।

আমি ইতস্তত করছিলুম। ডাক্তার বললেন : না না সে হবে না। আপনাকে আসতেই হবে। গাড়ি পাঠালে পাছে ফিরিয়ে দেন, তাই সবাই মিলে এসেচি।

অগত্যা বেরুতে হল !

কলতলা থেকে রঞ্জন ফিরছিল। বললুম : বিশেষ কাজে হঠাৎ এখুনি বেরুতে হচ্ছে ভাই, চাটা আজ তুমি একাই খেও।

গাড়ির পেছনের গদিতে বসে ছিল তনু আর নিতা। খোলা দরজা দিয়ে তাদের প্রতি একটা দৃষ্টিক্ষেপ করেই রঞ্জন হাসল। ভাবখানাএই রকম যে একটা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে ফিরতে যেন আমার ভুল না হয়।

এক ঝুড়ি অভিযোগ নিয়ে কলহ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিল প্রগলভ নিতা। গাড়িতে পা দিতেই বোমার মতো ফেটে উঠল : আপনার মতো অদ্ভুত লোক আমরা আজও দেখিনি। এতোদিন হল ফিরেচেন, অথচ একদিনও আমাদের খোঁজ নিতে গেলেন না!

বললুম : তুমি তো জানো, যাদের কাজ নেই কোনো, সময়ের অভাব তাদেরই সবচেয়ে বেশি। তার ওপর তোমাদের বাড়িটা আবার সৃষ্টিছাড়া মুলুকে। এক সঙ্গে অতটা পথ হাঁটলে পরদিন আর কোমরের ব্যথায় উঠতে হবে না!

নিতা আশ্চর্য হল, বলল : সেকি, হাঁটবেন কেন! কলকাতা সহরে কি গাড়ি ঘোড়ার অভাব!

বললুম : গাড়িতে চড়া তো সৌখিনতা! ও বড়লোকমির পয়সা আমাদের কোথায়!

নিতা বলল : গরিব লোকের মতো না হয় ট্রামেই উঠতেন!

বললুল : তাতেও অনেক পয়সার দরকার!

নিতা এবারে বুঝি রাগ করল, বলল : পয়সা দেব দুটো, গানও শুনব অক্রুর হরণ। তার চেয়ে সত্যি কথাটা বলেই ফেলুন না যে আমাদের বাড়ি যাবার ইচ্ছা আপনার একবারও হয়নি!

বললুম : এইবারে ঠিক ধ[illegible] কুঁড়ে মানুষের নড়ে চড়ে বসতেই যে কষ্ট হয়। সেই গল্পটা জানতো! এক রাজা তার রাজ্যের কুঁড়েদের কাজ না করে স্বচ্ছন্দে খেয়ে পরে থাকবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। তারপর একদিন দেখা গেল যে রাজ্যে কুঁড়ের সংখ্যা এতো বেড়েছে যে কাজ করবার লোক আর পাওয়া যায় না। মহাচিন্তাগ্রস্ত রাজা বললেন, 'মন্ত্রী এ কী হল!' ঘাড় চুলকে মন্ত্রী

বললেন, 'তাই তো মহারাজ, এ কী হল!' রাজার প্রিয় বয়স্য মণিহংস। তিনি বললেন, 'আমি এর বিহিত করচি।' বলে কুঁড়েদের কুঁড়েতে দিলেন আগুন ধরিয়ে। সবাই ছুটে বেরিয়ে পড়ল। বেরল না শুধু দুজন। একজন বলল, 'পি, পু' অর্থাৎ পিঠ পুড়চে। আরেকজন বুদ্ধি দিল, 'ফি, শো' অর্থাৎ ফিরে শোও। সেপাই এসে, তাদের টেনে বার করল। বয়স্যের পিঠ চাপড়ে রাজা বললেন, 'সাবাস, এরাই কুঁড়ে বটে।'

গল্পটা পুরনো হলেও তনু আর ডাক্তার এক সঙ্গে হেসে উঠলেন। কিন্তু নিতার রাগ যেন বেড়ে গেল। নিজের পরাজয় অপরে উপভোগ করছে, এ তার সহ্য হল না। বলল: কুঁড়েমি না আর কিছু! ইচ্ছে থাকলে মানুষ হনলুলু থেকেও মক্কা পাড়ি দেয়।

হেসে বললুম: তা দেয় বটে, কিন্তু টিকিট কাটবার টাকাটা তার ট্যাঁকে থাকা চাই।

দাঁতে দাঁত ঘষে নিতা বলল: শুধু টাকা আর টাকা। জীবনে টাকাটাই শুধু চিনেচেন দেখচি!

গম্ভীরভাবে বললুম: টাকা ধর্ম টাকা মোক্ষ—

অস্থিরভাবে নিতা বলল: ভদ্রতায় নির্মাল্যবাবুর তুলনা নেই। এমন দিন নেই যেদিন তিনি আমাদের খোঁজ নেন না।

বললুম: আমার তিনখানা গাড়ি থাকলে আমিও ভদ্রলোক নাম কিনতে পারতুম।

নিতা বলল: আমি কি আপনাকে অভদ্র বলেচি?

বললুম: ভদ্রলোক যে নই, সেই কথাই তো শুরু থেকে প্রমাণ করতে চাইছ।

সহসা নিতা একথার উত্তর খুঁজে পেল না। তনু বলল : তোমরা কি সারাটা পথ ঝগড়াই করবে বিশুদা ?

জোর পেয়ে নিতা বলল : দেখো তো বৌদি, একদিনও খোঁজ নেননি বললে কোথায় একটু লজ্জা পাবেন, তা নয়তো সেই থেকে আমার সঙ্গেই কোমর বেঁধে লড়চেন।

আমার কোমরের কাপড় একটু আলগা হয়েছিল। এইবারে ভালো করে পরে বললুম : শক্ত করে কোমর বাঁধিনি তো, এতক্ষণ আলগাই ছিল।

কথার ধরনে এবারে নিতাও হেসে ফেলল, বলল : পারিনে আপনার সঙ্গে।

বললুম : একথাটা আগে স্বীকার করলে আমাকেও এতক্ষণ বকতে হত না।

তনু বলল : চল, খানিকটা বেড়িয়ে যাওয়া যাক !

আমি ব্যস্ত হলুম, বললুম : আমায় মাপ করো তনু, খালি পেটে বেড়িয়ে বেড়াবার মতো উদারতা আমার নেই। কিছু খাইয়ে দাও আগে, তারপর এ অধম দাসানুদাস। যা হুকুম করবে, মহানন্দে তাই তামিল করে ধন্য হব।

তনু বলল : তবেই মুস্কিলে ফেললে ; আমরা যে ও পর্ব চুকিয়ে বেরিয়েচি।

বললুম : সে আমি বুঝিনে। এখন মেসে ফিরে যাওয়াও বৃথা। রঞ্জনকে জানিয়ে এসেছি যখন, তখন আমার আফ্‌টারনুন চটা ঠাকুর চাকরদের ভেতর নিশ্চয়ই বিলিয়ে দিয়েচে।

নিতার কৌতূহল বেশি। বলল : কী খান বিকেলে ?

হেসে বললুম : বেশি আর কী ! ফারপোর সবচেয়ে বড় রুটি

একখানা, আধকৌটা মাখন, আর বড় এক পট চা। এইটুকুতেই চালিয়ে নিই বিকেলটা। তবে দুঃখ এই যে তাই থেকে দু শ্লাইস রুটি আর এক পেয়ালা চা রঞ্জনকে ভাগ দিতে হয়। সে ভদ্রলোক আমায় করে কর্মে খাওয়ান কিনা!

গম্ভীরভাবে নিতা বলল: হাতির খোরাক! আমরা তিনজনেও অতো খেতে পারি না।

বললুম: তবেই দেখ, পয়সা বললেই পয়সা আসে কোথা থেকে। খেতেই আমার কুলোয় না।

কিন্তু এতটুকু খবরেই নিতা সন্তুষ্ট হল না, বলল: রাতে কী খান? বললুম: সেটা আমাদের নিজে কিনে খেতে হয় না। সে খাওয়া হয় ম্যানেজার বাবুর সুব্যবস্থায়।

কী পান খেতে?

নিতা প্রশ্ন করল।

বললুম: কাঁকরমণি চালের ভাত একথালা। দু হাতা ডালের জল, খানিকটা কুমড়োর ঘ্যাঁট, আর এক বাটি ইলিশ মাছের ঝোল।

ডাক্তার শোণাপুরকার অট্টহাস্য করে উঠলেন। চোখ দুটো ছানা বড়ার মতো করে নিতা বলল: শুধু ঝোল, মাছ দেয় না?

বললুম: দেবে না কেন, কিন্তু পান কৌড়ির মতো লম্বা ঠোঁট না হলে সে মাছ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

তনু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, বলল: তোমারও এই খাওয়া?

তার গাম্ভীর্য দেখে হাসি পেল। বললুম: মেসে আবার দুরকম খাওয়া হয় নাকি? তবে মাসের শেষে ঠাকুরকে দুটো করে টাকা বকশিষ দিই বলে মাঝে মাঝে লুকিয়ে আমায় দুখানা বড় টুকরোও দেয়।

নিতা আমার হাসিতে যোগ দিয়ে বলল: এই জন্যেই বুঝি রঞ্জনবাবু আপনার চায়ের ভাগটা ঠাকুর চাকরকে দিচ্ছেন ?

বললুম: উদ্দেশ্য সবারই সাধু! অকারণে আমাদের সন্দেহ কোরো না।

নিতার আরও প্রশ্ন ছিল। বলল: রোজই আপনাদের এই ব্যবস্থা ?

বললুম: তা কেন হবে, আমরাও ফিষ্ট খাই তোমাদের মতন। প্রতি শুক্রবার রাতে আমাদের ফিষ্ট, সেদিন মাছের বদলে মাংস খাই আমরা।

একসঙ্গে হেসে উঠল দুই ভাই বোন। তনু যোগ দিল না তাদের হাসিতে। বিচলিত ভাবে বলল: কতদিন আছ এই মেসে ?

বললুম: গোড়া থেকেই তো এখানে।

আর কি ভালো মেস পাওয়া যায় না? তনুর কণ্ঠে যেন খানিকটা কাতরতা।

বললুম: যাবে না কেন, কিন্তু সবই প্রায় এক রকম। তাছাড়া মায়াও পড়ে গেছে সকলের ওপর, কতদিনের জানা শুনো!

বর্ষার নবীন মেঘের ছায়া পড়েছে তৃণশ্যামল ময়দানের ওপর। গাড়ির ভেতরেও যেন তার খানিকটা ছায়া নামল।

( ৩ )

বালিগঞ্জে তন্নুর নিজের বাড়ি। তার মায়ের কাছে পাওয়া। পিতা মাতার একমাত্র কন্যা নানা সম্পত্তির সঙ্গে এই বাড়িখানিও পেয়েছে। কখনো কলকাতায় এলে তারা এই বাড়িতেই ওঠে। অন্য সময় খালি পড়ে থাকে।

বাড়ির সামনে বাগান আছে একটুখানি। বর্ষার নতুন জলে গাছপালা উৎসাহ পেয়েছে খানিকটা। জারবেরার গুচ্ছ ছাড়িয়ে উঠছে লিক্‌লিকে সবুজ ঘাস। পোর্টুলেকা বুঁজে গেছে, ফুলের ভেতর জিনিয়াই ফুটে আছে নানা রঙের। টবে জেসনারা ফুটেছে পোর্টিকোর পাশে, পদ্মপাতার মতো বিগোনিয়া ঝুলছে ওপর থেকে।

গাড়ি-বারান্দার ভেতরে এসে নামলুম। বেয়ারা দরজা খুলে দিল।

তন্নুর বিয়ের আগে এ বাড়িতে অনেকবার এসেছি। কাশী থেকে তার বিধবা মা কখনো কলকাতায় এলে এই বাড়িতেই উঠতেন। তন্নু আসত শান্তিনিকেতন থেকে। আমার তখন অগাধ অধিকার, আবদার গিয়ে দাঁড়াত অত্যাচারে। তন্নুর মা আমাকে ভালবাসতেন, তাঁর অকৃপণ প্রাণের সমস্ত স্নেহ উজার করে দিয়ে তাঁর পুত্র-ক্ষুধা মেটাতেন। নিজের মায়ের কথা আমার মনে পড়ে না। তন্নুর মাকেই অনেক সময় নিজের মা বলে ভুল হত।

আজ অনেকদিন পরে এলুম এ বাড়িতে। খানিকটা অযত্ন খানিকটা অনাদর দেখলুম চারি পাশে। পরিচ্ছন্ন বারান্দাটা আজ

উদার আলোয় উজ্জ্বল নয়, একটু স্যাঁৎসেঁতে, একটু যেন ছায়াচ্ছন্ন। প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে মনটা আগের মত আর দুলে উঠল না।

তনু বোধ হয় লক্ষ্য করছিল আমাকে, বলল: কী ভাবচ?

ডাক্তার শোলাপুরকার অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। তনুর কথার উত্তরে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

মার কথা মনে পড়চে, না?

কিছুমাত্র চিন্তা না করে তনু এ প্রশ্ন করে বসল।

আমি চমকে উঠলুম। একদা আমাদের বৈজ্ঞানিক দেখেছিলেন যে এক সুরে বাঁধা দুখানা তারের যন্ত্র মুখোমুখি রাখলে একটার স্পন্দন জাগে আরেকটার তারে। মানুষের মনও কি তারের যন্ত্রের মতো ধ্বনিময়! বললুম: সত্যিই তাই ভাবচি।

তনু এ কথার জবাব দিল না।

বসবার ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়েছিল নিতা। মিষ্টি গলায় তাড়া দিল, বলল: তোমরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে যে বৌদি!

তনু এগিয়ে গেল। আমি গেলুম পেছনে।

ঘরে ডাক্তার শোলাপুরকারকে দেখে বুঝতে পারলুম যে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেকটা সময় নষ্ট করেছি আমরা। ভদ্রলোক ইতিমধ্যে তাঁর পোষাক বদলি করে এসেছেন। সাদা সার্টের ওপর একটা গাউন চাপিয়ে নিয়েছেন। আমি লজ্জা পেলুম নিতার কাছে। চেরা পর্দার ফাঁক দিয়ে গলে বেরবার সময় অকারণে খানিকটা কৈফিয়ৎ দিলুম: অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে নিতা আমার লজ্জা আরও বাড়িয়ে দিল। নীরবতা যে কথার চেয়ে বেশি কার্যকরী, এইসব সময়ে তা

স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই তার হাসিরও জবাব দিতে হল, বললুম : দু বছর পর আবার সব দেখছি।

এবারেও নিতা হাসল।

আমি হেরে গেলুম।

ঘরে ঢুকে ডিভানের ওপর বসলুম পা তুলে। তন্নু কী একটা বলতে যাচ্ছিল। নিতা একখানা আরাম চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। দু হাতে তালিও বাজাল গোটাকয়েক।

তন্নু চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল : কী হল তোমার ?

হাসতে হাসতেই জবাব দিল নিতা, বলল : হারিয়ে দিয়েছি বিশুবাবুকে। গাড়িতে কথায় পেরে উঠিনি তো! এবারে হেসে হারিয়ে দিলাম।

তন্নুও হাসল তার কথার ধরনে। বলল : তোমরা হারজিত নিয়ে বোঝাপড়া কর, আমি যাই বিশুদার খাবার আয়োজন করতে।

শাড়ির আঁচলখানা কোমরে জরিয়ে তন্নু বেরিয়ে গেল।

পাশের দরজা দিয়ে ডাক্তার শোলাপুরকার কখন বেরিয়ে গিয়েছিলেন, দেখতে পাইনি। একখানা বই হাতে করে আবার ভেতরে এলেন। সামনের দরজার দিকে এক নজর দিয়ে ইংরেজিতে হাঁকলেন : কে!

দুবার কেশে নির্মাল্য ভেতরে এল।

নির্মাল্যবাবু যে আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।

বলে বাঙলার ভাঙা উচ্চারণে ডাক্তার তাঁর কর্কশ ইংরেজী প্রশ্নের অসৌজন্যকে মোলায়েম করবার চেষ্টা করলেন।

আমি সোজা হয়ে বসে নিঃশব্দে তাঁকে অভ্যর্থনা করলুম।

বিকেল থেকে আজ আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমার দিকে চেয়ে নির্মাল্য এই প্রথম কথা কইল। খানিকটা অসন্তোষ দেখলুম তার চোখের দৃষ্টিতে।

অনেকদিন পরে আজ প্রথম মেসের বাইরে বেরিয়েছি। সেও অল্পক্ষণ আগে। নিজের দোষ তবু স্বীকার করে নিলুম। বললুম: সত্যিই আপনাকে ভারি কষ্ট দিলুম।

নির্মাল্য আর ভূমিকা বাড়াল না, সোজাসুজি কাজের কথায় নেমে পড়ল। বলল: একটা দুঃসংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছি।

দু হাতে দু থালা ফল মূল আর মিষ্টি নিয়ে তনু ফিরে এসেছিল। কেমন আড়ষ্ট হল দুঃসংবাদের কথা শুনে।

বললুম: কোনো বিপদে পড়লেন কি?

নির্মাল্য বলল: নিজে বিপদে পড়লে এতো বিচলিত হতুম না। ভাবনা হচ্চে আপনাকে বিপদে জড়িয়েচি বলে।

তবে ঠিক আছে।

বলে নিজেই তনুর হাতের খাবার কেড়ে নিলুম।

এতো কষ্ট করে ফল কেন কেটে দাও, বুঝতে পারিনা। বত্রিশ পাটি দাঁত দিয়েছেন ভগবান, সে কি ম্যাক্লিনের বিজ্ঞাপনের জন্যে!

তার দুঃসংবাদের খবর পেয়েও চিন্তিত হলুম না দেখে নির্মাল্য রুষ্ট হল। বললুম: আপনিও নিন না কিছু?

বলে এক থালা তাঁর দিকেও বাড়িয়ে দিলুম।

নির্মাল্য হাত গুটিয়ে নিল। কথা কইল না।

তনু তার বড় বড় চোখ জোড়া নির্মাল্যর মুখের ওপর তুলে ধরল। নিতা এগিয়ে এল সামনে। আর ইংরিজিতে প্রশ্ন জানালেন ডাক্তার শোলাপুরকার।

নির্মাল্য বলল : ঠাট্টা নয় বিশ্বপতিবাবু। ব্যাপারটা একটু ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের নিমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিপদের ভেতর ফেলব, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। অবিলম্বে একটা বিহিত করতে না পারলে এই দায়িত্বহীনতা আমাকে সারা-জীবন পীড়া দেবে।

নির্মাল্যের ভূমিকার চেয়ে খেতে আমার ভাল লাগছিল। মনে হল নিতা চটেছে মনে মনে। খাওয়াটা পালিয়ে যাচ্ছে না, নির্মাল্যের সব কথা শোনার পরেও আহারে মন দেয়া চলে।

ধপ করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে তনু বলল : তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন নির্মাল্যবাবু, ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে যাচ্চে।

নির্মাল্য আগেই একখানা চেয়ারে বসে পড়েছিল। বলল : সেদিনের ঘটনাটা আপনাদের মনে পড়ে ? ডিঙিতে উজিয়ে চলতে পাকা মাঝিরা পিছিয়ে পড়ল বিশ্বপতিবাবুর কাছে ?

ব্যস্তভাবে তনু বলল : পড়ে বৈকি ! দেশসুদ্ধ লোক তাদের ছি ছি করল হেরে যাবার জন্যে !

নির্মাল্য বলল : এই অপমানের প্রতিশোধ নিচ্চে তারা। মিথ্যে করে নাকি থানায় জানিয়ে এসেচে, বিশ্বপতিবাবু মার পিট করেচেন কয়েকজনদের ওপর। কেউ কেউ আবার দেহের ক্ষত পর্যন্ত দেখিয়ে এসেচে পুলিসকে। তাদের অপরাধ বলেছে, বেশি ভাড়া চেয়েছিল অতিথিদের কাছে।

উত্তেজিতভাবে নির্মাল্য বলল : কী অন্যায় বলুন ! আমাদেরই প্রজা, আমাদের অতিথিদের পৌঁছে শুধু ভাড়া নয়, প্রচুর বকশিস পেয়েছে বাবার কাছে। তাদের এমন সাহস হল !

মেয়েদের মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল।

নির্মাল্য থামল না, বলল : কারা এসব দুর্বুদ্ধি যোগাচ্ছে আমি জানি। কতগুলো হতভাগা দেশের কল্যাণ করব বলে গ্রামের ছোটলোকদের ওস্কাচ্ছে জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। যে তাদের ছাপ্পান্ন পুরুষ প্রতিপালন করেছে সুদিনে দুর্দিনে, আজ তাকে তাদের শত্রু বলে ভাবতে শেখাচ্ছে।

নির্মাল্য কথা বলে না বেশি। এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে লাগল। ব্যস্তভাবে তনু বলল : কী হবে নির্মাল্যবাবু?

থালা দুখানা তখন আমি প্রায় সামলে এনেছিলুম। বললুম : কী আর হবে! না হয় আরেকবার শ্রীনিবাস ঘুরে আসব! তবে সত্যিকার নিরপরাধ লোক বড় একটা সাজা পায় না, এই যা ভরসা!

আপনি একবার জেলে গিয়েছিলেন? —নিতার প্রশ্নে প্রচুর বিস্ময় ধরা পড়ল।

বললুম : গিয়েছিলুম বৈকি, তবে জেল খাটিনি। একটা দাঙ্গার সময় আমার লাঠিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে ছিল বলে সরকার আমায় আটকেছিলেন। জামিনেও ছাড়তে রাজী হননি। দিন কয়েক রাজ-অন্ন ধ্বংস করার পর বিচারে ছাড়পত্র পেয়ে গেলুম।

হেসে যোগ করলুম : এবারে না হয় বাকি অভিজ্ঞতাটুকুও সঞ্চয় করে আসব।

ডাক্তার শোলাপুরকার কাজের লোক। ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন : আমাদের এখন কী করা কর্তব্য?

নির্মাল্য আশ্বাস দিয়ে বলল : সে ভার আমার একার। আজ রাত্তের গাড়িতেই আমি দেশে যাচ্ছি। সেখানে সবাইকে ডেকে এনে একটা মিটমাট করে তবে ফিরব।

ডাক্তার বললেন : তাহলে আপনার ওপরেই আমরা ভরসা করে রইলুম।

নির্মাল্য উঠে দাঁড়িয়েছিল।

তনু বলল : 'তারে' একটা খবর দেবেন কিন্তু।

আচ্ছা নমস্কার।

বলে দ্রুত পদে নির্মাল্য নেমে গেল।

( ৪ )

তনুদের গাড়ি যখন মেসের খোলা দরজার সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল রাত তখনও গভীর হয়নি। কিন্তু ক্লান্ত হয়েছে মন। বিনিদ্র রজনীর গ্লানির মতো দেহটাও অবসন্ন মনে হল। যে দুঃসংবাদ বহন করে এসেছিল বন্ধু নির্মাল্য, সত্যের কষ্টিপাথরে তার যাচাই হল না বটে, মনটা তবু ভারি হয়ে রইল। মিথ্যা হলেও নির্মাল্য তার প্রাপ্য পাবে। হিরো হবার মতো বাহাদুরী থেকে বঞ্চিত হবে না নিশ্চয়ই। প্রাত্যহিক সঙ্কীর্ণতায় ভরা কোনো রহস্য যে এর ভেতর আছে এমনি একটা সন্দেহ ঘনিয়ে রইল মনের কোণে। জামার বোতাম খুলতে খুলতে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালুম।

স্বল্প আলোয় খপ করে কে আমার ডান হাতটা চেপে ধরল। ভালো করে তাকিয়ে দেখবার আগেই রঞ্জন বলল : চুপ। আমি

রঞ্জন। তাড়াতাড়ি ঘরে এস, গোটাকতক জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে।

ব্যাপারটা অভাবনীয়। তাই খানিকটা বিচলিত হলুম। রঞ্জনকে গম্ভীর হতে কখনো দেখিনি। তার কণ্ঠে শুনিনি উদ্বেগের আভাস। সারাদিন নিঃশব্দে নিজের কাজ করে, আর অবসরের সময় রসালাপ করে দেবেশ বাবুর সঙ্গে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপারে তার মতামত জিজ্ঞাসা করলে উত্তরটা এড়িয়ে যায়। বলে: আমি আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে আমার কী দরকার।

ঘরে এসে রঞ্জন আবার কথা কইল, বলল: কোনদিন তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। আজ আমার গোটা কয়েক প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও।

উত্তর না দিয়ে তার মুখের দিকে শুধু চাইলুম।

রঞ্জন বলল: তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমাদের আজকের আলোচনার একটি কথাও তৃতীয় ব্যক্তির কানে উঠবে না। জবাবে গোঁজামিল দিলে তুমি নিজেই ঠকবে।

এমন ভূমিকার হঠাৎ কী প্রয়োজন হল জানি না। রঞ্জন নিজেই খানিকটা কৈফিয়ৎ দিল। বলল: সত্যি বলতে কি, তোমাকে চিন্তিত হতে কখনো দেখি নি। মোটা মোটা বই পুঁথি খুলে যখন গভীরভাবে চিন্তা কর, তখনও তোমাকে দেখি, মুখের প্রসন্ন ভাবটুকু সারাক্ষণ জেগে আছে। সন্দেহের কিছু কারণ ঘটেছে আজ, তাই দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে তোমার অপেক্ষা করছিলুম। মনে হল, মস্ত বড় দুশ্চিন্তা নিয়ে তুমি নামলে। সত্যিকথা খুলে বললে আমিও বোধ হয় খানিকটা সাহায্য করতে পারব।

আজ রঞ্জনের আরেকটা রূপ আমার চোখে পড়েছে। সেটা

স্থিতধী, সুবেদী ও সংবেদনশীল। হাল্কা হাসির আড়ালে তার সত্যিকার রূপটা রেখেছে লুকিয়ে। তার সন্দেহ সমর্থন করে বললুম : দুশ্চিন্তার কারণ কিছুটা সত্যিই ঘটেছে।

ঘটনাটা শোনবার আগেই বলল : এর ভেতর নির্মাল্যবাবু আছে ?

বললুম : হ্যাঁ।

কোনো মেয়েকে সে ভালবাসে ?

এবারেও হ্যাঁ বললুম।

তুমি চেনো সেই মেয়েকে ?

অদ্ভুতভাবে গলাটা কেঁপে গেল হ্যাঁ বলার সময়।

রঞ্জন বলল : এর বেশি জানবার প্রয়োজন আমার নেই, তবে কৌতূহল আছে। আপত্তি না থাকলে জানাতে পার।

নিজের অজ্ঞাতসারেই এতক্ষণ এই হ্যাঁ গুলি বলে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ মনে হল, আমার নিজের প্রশ্নের উত্তরও যেন পেয়ে গেছি। এদিকটা আমার মাথায় আসেনি এতক্ষণ, আসতে পারে না। রঞ্জনের প্রশ্ন আমার চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। মনে হল, আজ এই লোকটির চোখের সামনে একটা মস্ত কেলেঙ্কারী ধরা পড়ে গেছে। গোপনে নির্মাল্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি, এমনি একটা কদর্য সত্য প্রতিপন্ন হয়ে গেল আমার নিজেরই কথায়। সহস্রভাবে সহস্রবার ধিক্কার দিলুম আপন ভাগ্যকে।

রঞ্জন আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বলল : ডাক্তার শোলাপুরকারের স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কতোদিনের পরিচয় ?

অপরাধীর মতো উত্তর দিলুম : অনেকদিনের।

এত সংক্ষিপ্ত উত্তরে সে সন্তুষ্ট হল না। জিজ্ঞাসু চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে বললুম : তনু বাঙালী মেয়ে। যে বয়স পর্যন্ত তারা অনাত্মীয় ছেলেদের সঙ্গে অবাধে খেলাধুলো হুড়োহুড়ি করে বেড়াতে পারে, তনুর সেই বয়সে আমাদের পরিচয়। শান্তি-নিকেতনে যাবার আগে কলকাতার কলেজে পড়েছিল কিছুদিন। তখনও মাঝে মাঝে দেখা হত। তার মা আমাকে স্নেহ করতেন। আমার মা নেই বলে নিজের ছেলের মতোই ভালবাসতেন। সামনে বসে আমাকে খাওয়াতে তার ভালো লাগে। কখনো কলকাতায় এলে এখনও আমার ডাক পরে।

রঞ্জন বিস্ময় প্রকাশ করল, বলল : বাঙালী মেয়ের বিয়ে হল মারাঠার সঙ্গে ? সুখী হয়েছে কি তারা ?

বললুম : ওরা নামে মারাঠা। ডাক্তারের বাবা বেহারে বড় কাজ করতেন, বাড়ি করেছিলেন দেওঘরে। ছেলে বিদ্যাপীঠের স্কুলে পড়ে ডাক্তারী শিখেছে বিলেত আর জার্মানীতে। মেয়ে মানুষ হচ্ছে শান্তিনিকেতনে। বিয়েটাও একটা দুর্ঘটনা নয়। তনু তখন শান্তিনিকেতনে পড়ে। ভক্ত পয়েছিল নিতাকে। বোনকে আনা নেওয়ার দেখাশুনোর উপলক্ষ নিয়ে সদ্য বিলেত ফেরত ডাক্তার ঘনিষ্ঠ হল তনুর সঙ্গে।

এর পরের ঘটনা রঞ্জন অনুমান করে নিয়েছে। জিজ্ঞেস করল : তোমার সঙ্গে তনুর বিয়ের কোনো কথা ওঠেনি কখনো ?

বললুম : না। তনুর মার হয়তো সেই রকম ইচ্ছে ছিল মনে মনে, কিন্তু সগোত্র বলে সে প্রসঙ্গ তোলবার সাহস পাননি। দীর্ঘদিনের সংস্কার ঝেড়ে ফেলতে যে সাহস চাই মানুষের, তার অভাব ছিল তাঁর ভেতর।

তোমরাও এ ব্যবস্থা মেনে নিলে ?

রঞ্জন জানতে চাইল।

বললুম : না মেনে আর উপায় কি ! সমাজে বাস করতে হলে সমাজের বিধি নিষেধ তো মেনে চলতেই হবে। এ তো একজনের জিনিষ নয়, এ দশের। কাজেই দশের মঙ্গলের জন্য একজনের হৃদয় বৃত্তির প্রশ্রয় দেয়া চলে না।

রঞ্জন চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল, বলল : ডাক্তার শোলাপুরকারের পরিবারের সঙ্গে কী সূত্রে নির্মাল্যবাবুর পরিচয় জানো ?

বললুম : জানি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষা না করে বললুম : আমিই পরিচয় করে দিয়েছি। শান্তিপ্রিয় লোক ডাক্তার শোলাপুরকার, রোগীর চেয়ে কাব্য ভালবাসেন। ভারতবর্ষে এত দেশ থাকতে শেষ পর্যন্ত দেওঘরকে বেছে নিলেন কর্মক্ষেত্ররূপে। বাপে প্রচুর পয়সা রেখে গেছেন, নির্লোভ মানুষটি তাই নির্জনতাই পছন্দ করলেন। তবু আমায় নিমন্ত্রণ করত। এম-এ পরীক্ষার পর সে নিমন্ত্রণ রক্ষার সুযোগ পেয়েছিলুম।

একটু থেমে বললুম :

আমার দেওঘর যাওয়া দেখেছ, জানো না তার আসল কারণ।

রঞ্জন বলল : বৈদ্যনাথ দর্শন তাহলে তোমার লক্ষ্য ছিল না, বল ?

আজ সে কথা মেনে নিলুম। বললুম : আরও একজন গিয়েছিল আমার সঙ্গে, সে নির্মাল্য। আমার সহপাঠী সে। ছাত্র-

জীবনের অলস অবসরে পরিচয় যে খানিকটা নিবিড় হবার সুযোগ পেয়েছিল, তা তুমিও দেখেচ। সে আমায় দার্জিলিং টানছিল, তাকে লোভ দেখালুম নিতার। দেওঘরে গিয়ে লোকটা সত্যিই মুগ্ধ হল।

দেওঘরের কথা বলতে গিয়ে পাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলি, সেই ভয়ে থেমে গেলুম।

রঞ্জন বলল ঃ নিতা নিশ্চয়ই মুড়ি মিছরির প্রভেদ করে!

তার প্রশ্নটা ঠিক ধরতে না পেরে নিঃশব্দে চাইলুম তার মুখের পানে। রঞ্জন নিজেই জবাব দিল, বলল ঃ নির্মাল্যবাবুর কথায় তাই মনে হল।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম ঃ ভদ্রলোক এসেছিল নাকি এখানে?

রঞ্জন হেসে বলল ঃ তোমরা চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে ভদ্রলোক গাড়ি হাঁকিয়ে এসে উপস্থিত। অনেক কথাই জিজ্ঞেস করল তোমাদের সম্বন্ধে। কোথায় গেছ তুমি, ডাক্তার শোলাপুর-কাররা এমনি আসেন নাকি মাঝে মাঝে, কখন এলে তোমাকে পাওয়া যায়, ইত্যাদি। তার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছিল ডাক্তার পরিবারের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতার বিষয় জানবার জন্যেই যেন এসেছেন।

রঞ্জনের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রশংসা করলুম মনে মনে। কথা বলে তাকে বাধা দিলুম না।

রঞ্জন বলল ঃ আমার কী মনে হল জানো? ভদ্রলোকের দুর্বলতা আছে কোথাও। মানুষের বাজারে নিতা তোমায় বেশি দাম দিচ্ছে,

বোধ হয় এমনি একটা আশঙ্কা পুষছে মনে মনে। তাই তার ভাবনা, তার অস্থিরতা।

মনে হল সিঁদুর তৈরী ছেড়ে হাত দেখতে বসলে রঞ্জন ভালো করত। সেই কথা তাকে বলতে যাচ্ছিলুম। রঞ্জন বলল: তোমাকে হারিয়ে দেবার কোনো ফন্দি এঁটেছেন ভদ্রলোক। হয় বিপদে ফেলে ডুবিয়ে দেবেন, নয় বিপদ থেকে উদ্ধার করে বাহাদুরী নেবেন। অনেক চেষ্টা করেও এই খবরটুকু বার করতে পারিনি।

রঞ্জন থামতেই একটা থমথমে গুমোট নামল ঘরের ভেতর। বলবার কথা আমারও আজ ফুরিয়ে গেছে। মোটা মোটা বই-খাতাগুলো টেবিলের ওপর ইতস্তত ছাড়ানো ছিল। যথাস্থানে সেগুলো গুছিয়ে রাখতে শুরু করলুম।

মেসের কোলাহল তখন থেমে গেছে। সন্ধ্যাবেলা যারা হৈহল্লা করেন, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছেন তাঁরা। যারা দেরীতে ফেরেন, দেরীতে খান, রান্নাঘরের চৌকাঠে পা ছড়িয়ে বসে ঠাকুর চাকর তাঁদের অপেক্ষা করছে।

রঞ্জন বলল: অনেকদিন থেকেই তো একবার বাড়ি যাবে যাবে করছিলে, এই সময়েই একবার ঘুরে এসো না সেখান থেকে। এদিকের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

ঝাপসা চোখের সামনে ভেসে উঠল একখানা দিগন্ত বিস্তৃত মুক্ত আকাশ। শৈশবের সেই স্তব্ধ শান্ত সুন্দর দিনগুলি। এখনো তার আকর্ষণ তেমনি নিবিড় হয়ে আছে। বললুম: সেই ভালো। সেখানে থাকবে আমার বই পুঁথি, শান্তির জন্যে সেই যথেষ্ট।

রঞ্জন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করল ; জগতে মেয়েরাই কি যতো অনর্থের মূলে !

দেয়ালের গায়ে ঠিক ঠিক করে ডাকল একটা টিক্‌টিকি !

কলকাতার মেস ছেড়ে যেদিন গ্রামের দিকে পা বাড়িয়েছিলুম, সেদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমার জীবনের আকাশে ঝড়ের মেঘ এমন ঘন হয়ে এসেছিল। উদার আলো আসবার এতটুকু ছিদ্র কোথাও ছিল না। চোখে ঠুলি পরে বিজলীর আলোকেই সত্য বলে জেনে ছিলুম।

কয়েকদিনের অসুখেই বাবা মারা গেলেন। তাঁর শেষ কৃত্যেই তাঁর রেখে যাওয়া শেষ কড়িটি পর্যন্ত ব্যয় হয়ে গেল। এতদিন রহস্য করে সহস্র বার যা বলেছি সকলকে, এখন তাই সত্য হয়ে উঠল। একে একে আত্মীয় পরিজনেরা সবাই সরে গেলেন, আমিও আবার ফিরে এলুম কলকাতায়।

জীবন যুদ্ধের গল্প পড়েছি কাব্যে, আধুনিক সাহিত্যে তার বাড়াবাড়ি দেখে হেসেছি অনেকদিন। বুকের রক্ত ঢেলে কেমন করে সংসারের বিরাট ঘানি থেকে এক এক ফোঁটা তেল চুঁইয়ে বার করে নিতে হয়, সে জ্ঞান সেদিন ছিল না। তবু একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভেবে ভয় পেয়েছিলুম। তাই মেসে না ফিরে পুরনো

পরিচয়ের সূত্র ধরে উঠলুম এককড়িদার বৈঠকখানায়। সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য না থাক, মাস গেলে খরচ জোগাবার দুর্ভাবনা নেই।

চাকরির বাজারে আজ দাম পেলুম না। বাঙালী ছেলেকে ভয় পায় অবাঙালী মনিবেরা। কাজের চেয়ে দল পাকায় বেশী। বুদ্ধির চেয়ে বড়াই এ বড়। কাজ না জানলে শিখিয়ে নেয়া যায়, কাজ না করলেও যায় মানিয়ে নেয়া। কিন্তু একটা বাঙালী ছেলে মাথা বেগড়াবে দশটা অবাঙালী কর্মীর। ছুঁতো পেলেই জিন্দাবাদ বলে ধর্মঘট শেখাবে। কেন শিখবে না আর পাঁচজনে! কাজে ফাঁকি দিতে কার না ভালো লাগে।

বাঙালী মনিবেরা দুঃখ করেন বাঙালী ছেলের জন্যে। একদিন যারা কাজ দেখিয়ে নাম কিনেছে, কাজ শিখিয়েছে সারা ভারতবর্ষের লোককে, আজ তারাই কাজ করতে ভুলে গেছে। বেশী পয়সা পেলেও ভালো কাজ করার ক্ষমতা নেই কারও। মিথ্যে তারা চেঁচামেচি করে।

বলেন, ইউনিয়নগুলো এদের মাথা খাচ্ছে। ভালো কাজ করতে এরা শেখায় না, ভাল করে কাজ করতেও বলে না এরা। মায়ে যেমন বেশি আদর দিয়ে ছেলে নষ্ট করে, এরাও তেমনি কর্মী নষ্ট করছে। বাঙালা যেমন সকলের আগে মাথা তুলেছিল, তেমনি তার মেরুদণ্ড ভাঙল সকলের আগে। জিন্দাবাদ না ভুললে এ মেরুদণ্ড আর সোজা হবে না।

আমি চাকরি পেলুম না। খবরের কাগজ ফিরি করেও আর পেট চলে না। 'প্রগতি' কাগজের সম্পাদক মশাই লেখা শুরু করবার পরামর্শ দিলেন।

বক্তৃতা ও লেখায় তো বাঙালীর জন্মগত অধিকার। জীবনে

কখনো বক্তৃতা দেয়নি বা কাগজে কিছু লেখেনি, এমন পুরুষের সাক্ষাৎ আজও পেয়েছি কি! আমার সংকল্পের কথা মনে পড়ল। আর যাই করি, জীবনে এ দুটো কাজ কখনো করব না। বাংলাদেশে একান্তভাবে শ্রোতা ও পাঠক অন্তত একজনও আছে, এই বিশ্বাসেই আনন্দ পাব মনে!

কিন্তু পেটের দায়ে একদিন সংকল্প ভাঙতে হল। ন্যাকামি বলে ঘেন্না করেছি যে কাজ সেই গল্প লেখাকেই পেশা বলে গ্রহণ করতে হল। গোটাকয়েক কাগজের দয়ায় দিন একরকম কেটে যাচ্ছিল।

সে দিন 'প্রগতি' অফিসের বিনয়বাবু আড়ালে ডেকে উপদেশ দিলেন, বললেনঃ এবারে একটু সুবিধে করে নিন বিশ্বপতিবাবু, লেখার দাম হয়েছে আপনার।

গলাটা আরেকটু নামিয়ে বললেনঃ লোকে ঠিকানাও চাইতে আসচে।

কিছু জবাব দেবার আগেই সম্পাদক মশায়ের কাচের কামরায় ডাক পড়ল। নিজের কাজ করতে করতে বললেনঃ বসুন!

নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করে আমি তাঁর আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

একসময় কাজ শেষ করে বললেনঃ এতদিন ধরে আপনার যে উপন্যাসখানা ছাপলুম মাসে মাসে সেগুলো জুড়ে বই বার করতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো কোনো?

আপত্তি!

আজকাল লেখা আমার অন্ন জোগায়। কী পরিশ্রমে যে লেখা আমায় পত্রস্থ করাতে হয়, তা লেখক মাত্রেরই জানা আছে।

সাহিত্যিকদের কথা আমি জানিনে, লিখে যাঁরা বাড়ি তুলছেন কলকাতার সদর রাস্তার ওপরে। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে দু চারখানা বই বাজারে না নামলে লেখার দাম পাওয়া একটা দুরূহ ব্যাপার।

কী উত্তর দেব ভাবছি। ভদ্রলোক নিজেই আবার কথা কইলেন, বললেন: আমার প্রকাশ বিভাগের সুনাম আপনার জানা আছে। আপনার মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না।

আমার মুখে তবু কথা জোগাল না।

পুশিঙের কথা ভাবছেন?

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

সে ভাবনা আমার। একটি লাইন লিখবেন আদিরসের। কাগজে কাগজে তার নগ্নতা সম্বন্ধে ধারালো সমালোচনা ছাপিয়ে দেব। বাইশ শো কপি জলের মতো কেটে যাবে।

হেসে বললেন: যুগের ধর্ম জানতে 'প্রগতি' সম্পাদকের আর বাকি নেই মশাই। এ মন্ত্রটি আগে জানলে অনেক দিনেই ঋণমুক্ত হতে পারতুম।

পুশিঙের এমন সহজ উপায়ের কথা এই প্রথম শুনলুম। বিস্মিত হয়ে বললুম: বলেন কি!

বিশ্বাস হলো না?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন: এই দেখুন, প্রগতির মুদ্রণের হিসেব।

দেরাজ থেকে একখানা গ্রাফের কাগজ বার করলেন। রুমাল দিয়ে চশমা জোড়া একবার মুছে বললেন: তেরশ একষট্টি সালের

আশ্বিনে দেড় হাজার, কার্তিকে হাজার, অগ্রাণে আটশ, পৌষে পাঁচশ, মাঘে পাঁচশ, ফাল্গুনে সাড়ে সাতশ, পুনর্মুদ্রণ আটশ, চৈত্রে দুহাজার, পুনর্মুদ্রণ হাজার, বাষট্টির বৈশাখে পাঁচহাজার, জ্যৈষ্ঠে ছহাজার, আষাঢ়ে আটহাজার। এবছরের পূজা সংখ্যা দশহাজার না ছাপলে আপনি আমায় তাড়িয়ে দেবেন।

কী করচি বলতে পারেন ?

আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন। উত্তরও দিলেন নিজেই। বললেন ঃ প্রবন্ধ একদম ছাপিনে। ছাপচি দুর্বোধ্য কবিতা, আর নির্লজ্জ গল্প। পাঠকের প্রশ্নোত্তর আর তারকার গোপন কথা। লজ্জা বর্জন করে অর্ধ নগ্ন ছবি ছাপচি দিশি ও বিদেশী নটীর। এতে দুর্ণাম রটচে যত কাগজের কাটতিও তত বাড়চে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঃ দেশের রুচি বদলে গেছে মশাই, পুরনো যুগটা এখনও আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে কেন ? আমরা তো দশের নই, আমরা দেশের। দশের জন্য দেশকে উপবাসী রাখতে আমরা পারিনে, কী বলেন ?

ভদ্রলোক আমার অন্নদাতা, তাই বলতে হল ঃ এ তো আপনার অভিজ্ঞতার কথা।

ভদ্রলোক উৎসাহ পেলেন, বললেন ঃ ঠিক বলেচেন। এই একটু আগে যে চিঠিখানা লিখছিলুম, কোথায় বলতে পারেন ?

প্রশ্নটা অনাবশ্যক ! তবু উত্তর দিতে হল, জানিনে।

লিখছিলুম হল্যাণ্ডের ট্রিল কোম্পানীর কাছে। তাদের এই ছবিখানা ছাপবার অনুমতির জন্যে !

বলে কাগজপত্রের ভেতর থেকে ছবিখানা বার করে দিলেন। একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলুম। দ্বিতীয় ব্যক্তির সামনে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে লজ্জাই করে।

ভদ্রলোক চোখ মুখ কুঁচকে বললেন: এই হচ্ছে আধুনিক রুচি! এ সংখ্যা দুহাজার কপি বেশি ছাপতে হবে।

বলবার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলুম না।

ভদ্রলোক আজ মন খুলে ধরেছেন। বললেন: প্রথমেই কিন্তু একাজ করিনি। তখন ভাল ছবিও দিতুম, ভাল লেখাও ছাপতুম। তাই সমঝদারের অভাব ঘটেছিল। সাধারণ পাঠককে কোনো মননশীল লেখকের রচনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে উত্তর পেয়েছি, 'সারাদিন খাটুনির পর ওসব লেখা পড়বার এনার্জি কোথায়!'

হঠাৎ ভ্রু কুঁচকে বললেন: ব্যবসায় ঘেন্না ধরে গেছে মশাই। কিন্তু কী করব! পেটের দায়ে সবই করতে হচ্চে।

আসতে পারি স্যার?

বলে বিনয়বাবু ভেতরে এলেন। একখানা চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন: আমাদের এক পাঠক জানিয়েছেন যে, অমল দত্তের উপন্যাসটা নাকি একখানা অ্যামেরিকান বটতলার দিশি সংস্করণ। ঘটনা মিলছেই, স্থানে স্থানে অনুবাদ বলেই মনে হচ্ছে।

চিঠিখানা টেবিলের উপর রেখে বিনয়বাবু বেরিয়ে গেলেন। আমি অবাক হয়ে চাইলুম সম্পাদক মশায়ের মুখের দিকে।

ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন: আশ্চর্য হচ্ছেন? কিন্তু এমন চিঠি তো প্রায় রোজই পাচ্চি।

কী ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন: আপনার আদর

আজ এই কারণেই। যা পাওয়া যায় আপনার কাছ থেকে, সে আপনার নিজের কথা, আপনার সমাজের ও আপনার দেশের ছবি। মনে হয়, নিজের সুখদুঃখই বুঝি ধরা দিচ্চে আরেকজনের জীবনের ভেতর দিয়ে।

হঠাৎ বড় অন্তরঙ্গ সুরে বললেন : আপনি আপত্তি করবেন না বিশ্বপতিবাবু, আপনার উপন্যাসখানা আমিই প্রকাশ করব পুস্তকাকারে।

একদিন এই বইখানা পত্রস্থ করবার জন্য অনুরোধ নিয়ে দিনের পর দিন হাঁটাহাটি করেছি তাঁর কাছে। আমলই দেন নি। সুবোধ মিত্র কিংবা নরেন ঘোষের লেখার এক কিস্তি পাবার আশ্বাস পেলেও আমাকে যে আমল দিতেন না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম। তাঁর কপাল মন্দ কিম্বা আমার ভাগ্য ভাল, তা বলতে পারিনে। এ বি কোনো ক্লাসের লেখকের লেখাই সময় মত সংগ্রহ হল না বলে থার্ড ক্লাস লেখকের লেখা তাঁকে নিতে হল। হঠাৎ কোনোদিন অনিবার্য কারণে আর ছাপা সম্ভব হল না বলে নতুন লেখা না শুরু করে দেন, শেষ পর্যন্ত এই ভয় ছিল মনে।

আজ বিশ্বাস হচ্ছিল না যে সেই সম্পাদক মশাই-ই আমার সঙ্গে কথা কইছেন। উত্তরটা তাই এলোমেলো হয়ে গেল। বললুম : আমার লেখা কি আধুনিক রুচি সম্পন্ন হবে? সে কাজ আমি পারবও না।

সম্পাদক মশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন আমাকে, তারপর বললেন : সাহিত্যের অন্য রস, তার দাম আলাদা। জনপ্রিয় হবার অন্য গুণ আছে আপনার লেখার ভেতর। সাধারণ পাঠক বলচে, আপনার মনীষকে মনে হচ্চে একটা জীবন্ত

মানুষ। ইলোরাকে সে ভালবাসে একথা কোথাও বলেন নি। অথচ এদের অন্তরের যোগাযোগ অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেই বাদল সন্ধ্যায় মনীষের সঙ্গে ইলোরার সাক্ষাৎকার একটা অপূর্ব রূপ পেয়েছে আপনার প্রকাশ ভঙ্গীতে। কিন্তু জয়শঙ্কর ইলোরাকে নিয়ে চলে গেল। তাকেই বিয়ে করল সেই মেয়েটা। কিন্তু সুখী হতে পারল কি? এই প্রশ্ন তাকে বিহ্বল করে অনেক নিঃসঙ্গ রাত্রি। অথচ এই নিদ্রাহীন রাতের ইতিহাস কারও কাছে প্রকাশ করা চলে না। মনুর অনুশাসন শিথিল হয়ে গেছে, উঠে যাচ্চে জাতি ও বর্ণভেদ। রঙমুগ্ধ ভারতবাসী সাগর পার থেকে কুলহীন কন্যা আনতে দ্বিধা করছে না। যত বাধা শুধু প্রদেশে প্রদেশে। রাজনৈতিক বিরোধ কি সামাজিক প্রতিবন্ধক হবে মিলনের? মানভূমের পুরুষ জয়শঙ্কর বর্ধমানের মেয়ে ইলোরাকেও আপনার ভাববে না? বিয়ের মন্ত্রের চেয়ে বড় হবে স্বার্থপর মন্ত্রীর কথা!

সম্পাদক মশায়ের আজ হল কী? কথা বলেন না বলে যে লোকের অখ্যাতি আছে সকলের কাছে, আজ যেন গ্রামোফোনের মত কথা বলছেন তিনি। নিজের কানকেও আজ আর বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না। উত্তর না পেয়েও সম্পাদক মশাই থামলেন না, বললেন: যারা আপনার পরিচয় চাইতে আসচে, তারা কী বলচে জানেন?

সে কথা আমার জানা নেই। চুপ করে রইলুম।

বলচে, উপন্যাসের শেষ এখানে হয় না। বাঙলার ছেলে মনীষ হেরে গিয়ে এখন ভালো মানুষ হয়ে যাবে, তা হয় না। আত্মহত্যা করল না, মদ ধরে দেবদাস হল না, সে ভাল। ব্যর্থ প্রেম তো জীবনের শেষ কথা নয়। তারপরেও যে একটা সার্থকতর জীবন হতে পারে,

তার ইঙ্গিতটুকু দিয়েছেন, পরিণতি দেখাননি। আজকের এই প্রাদেশিক কড়াকাড়ির যুগে, একটা মীমাংসার নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেটুকু এড়িয়ে গিয়ে সাহিত্যের আদর্শ রক্ষা করেছেন, দেশের প্রয়োজন মেটাননি।

আস্তে আস্তে বললুমঃ তার পরের ঘটনা যে আমারও জানা নেই।

কথায় কথায় রাত বেড়ে চলল। আমার 'অসমাপ্তিকাকে' পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতি নিয়ে ভদ্রলোক ছাড়লেন। প্রশংসায় আত্মপ্রসাদ আছে, খ্যাতির লোভ আছে মানুষের হাড়ে ও মজ্জায়। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা হল না।

পথে নেমে একটি কথা মনে এল বার বার। আমি সেই ব্যর্থ-জীবন, ভগ্নোদ্যম বিশ্বপতি। হঠাৎ আমার দাম বাড়ল কিসে! খ্যাতির জন্য লিখিনি, লিখেছি কয়েকটা টাকার জন্যে। দাম যা তা লেখার নয়, আমার অধ্যবসায়ের। সকাল সন্ধ্যা ধন্না দিয়ে সামান্য যা আদায় করেছি, চক্ষু লজ্জার খাতিরেই তা তাঁদের দিতে হয়েছে। আজ মনে হল, কোথায় কী একটা গণ্ডগোল যেন হয়ে গেছে। তা না হলে সুবোধ মিত্র আর নরেন ঘোষের বই ফেলে বিশ্বপতির বই ছাপছেন প্রগতি পাবলিশার্সের ঝানু মালিক!

তবু ভাল লাগল আজকের সন্ধ্যেটা! ব্যর্থতার দিনগুলো হঠাৎ ভুলে যেতে ইচ্ছে হল।

ঘড় ঘড় করে একখানা ট্রাম পাশ দিয়ে পেরিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়ালুম। এমনি অন্যমনস্কভাবে পথ পেরবার সময়েই লোকে কাটা পড়ে। একটু সাবধান হয়ে আবার চলতে শুরু করলুম।

ছোটবেলায় মাষ্টার মশাইরা বলতেন, অহংকারেই আমার পতন হবে। কথাটা তখন বিশ্বাস করিনি। এখন করি। মনে প্রাণে অহংকার এমন ঘনিয়ে না থাকলে নিজের নির্বাসন গ্রহণ করতুম না। এক সময় অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছি। পাছে অনুগ্রহ নেবার দুর্বলতা আসে, এই ভয়ে কারও সঙ্গেই সম্পর্ক রাখিনি। কলকাতায় ফিরে এসে অবধি কলেজ রোর মেসে যাইনি। রঞ্জন আমাকে সত্যিই ভালবাসে, অসহায় দেখলে সেই আমার ভার নিত সাগ্রহে। তনুদেরও খবর নিইনি, জীবনযুদ্ধে নিজের পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করার লজ্জা ছিল: আশ্চর্যভাবে দীর্ঘদিন এইসব পরিচিতদের এড়িয়ে গেছি।

কিন্তু বেশিদিন এভাবে কাটল না। আমি যাদের এড়িয়ে চলেছি, তারাই আমায় খুঁজে বার করল।

সেদিন এককড়িদার বৈঠকখানায় তক্তপোষে বসে কিছু লেখার চেষ্টা করছি। বেলা পড়ে এসেছে, অন্ধকার হতে আর বেশি দেরী নেই। একখানা সুদৃশ্য গাড়ি এসে বাইরে দাঁড়াল। তনুর জন্মদিনের নিমন্ত্রণ পত্র পেলুম বাঙালী চালকের হাতে।

আমার 'অসমাপ্তিকার' মুদ্রণ তখন সমাপ্ত হয়েছে। কাল বই বাঁধাই হচ্ছে দেখে এসেছি। একবার 'প্রগতি' অফিসে যাবার নির্দেশ দিয়ে সেই গাড়িতেই চেপে বসলুম। ইচ্ছে হল, আমার প্রথম বইএর প্রথম কপি তনুকেই উপহার দেব।

সম্পাদক মশায়ের ব্যবহার আজকাল বদলে গেছে। একদা আমায় তিনি দয়া করতেন। এখন যেন আমার দয়া পেলেই কৃতার্থ হন। আমি ভাবনায় পড়ি। এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ খুঁজে না পেয়ে যথার্থ ই শঙ্কিত হই।

আমার উদ্দেশ্য জেনে ভদ্রলোক খুশি হলেন। বললেন: উপহারের পাতায় নামটা তাড়াতাড়ি ছেপে দেব কি?

বললুম: পারবেন এত তাড়াতাড়ি?

ভদ্রলোক হেসে বললেন: বলুন না নামটা?

বললুম।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ভদ্রলোক তৈরি করে দিলেন। বললেন: আপনার জন্যে পঁচিশ কপি সরিয়ে রেখেচি। দরকার মতো ব্যবহার করতে সঙ্কোচ করবেন না।

ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠলুম।

সিঁড়ির ওপরেই তনু অপেক্ষা করছিল। গাড়ি থামতেই দরজা খুলে নামিয়ে নিল। শব্দ পেয়ে ডাক্তার শোলাপুরকারও ছুটে এলেন। মিলিটারি কায়দায় বুট ঠুকে নমস্কার করলেন: Guten Abend.

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পড়বার সময় জর্মন ভাষার চর্চা করেছিলুম কিছুদিন। শিষ্টাচার বিনিময়ের গোটাকয়েক শব্দও স্মরণ ছিল। বললুম: Es freut mich sehr Sie zu treffen (আপনার দেখা পেয়ে ভারি খুশি হলুম)।

আনন্দে ডাক্তার শোলাপুরকার যেন লাফিয়ে উঠলেন। বললেন: দেখলে তনু, যার প্রাণ ভালবাসে, এ ভাষা তারা শিখবেই।

নিমন্ত্রিত আরও অনেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন চারদিকে

তাঁদের দিকে চেয়ে বললেন : বেঁচে আছি বলে যদি কোনো জাত আজ গর্ব করতে পারে তো সে ঐ জর্মন। লোকগুলোর মতো তাদের ভাষাতেও আমি প্রাণের সাড়া পাই।

কথাগুলো ভদ্রলোক ইংরেজীতেই বলেছিলেন, তনু জবাব দিল বাঙলায়। বলল : রাখো তোমার প্রাণের সাড়া, ওসব খটমটি আমার ভালো লাগে না। এসো বিশুদা, তোমার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই।

ডাক্তার বিস্মিত হলেন, আত্মস্থভাবে বললেন : Wie Schade! (কী লজ্জা!) জর্মন উচ্চারণকে তুমি বলচ খটমটি! গেটে দেখচি ঠিকই বলেচেন :

Wer fremde Sprache nicht kennt,
Weiszt nichts von Seiner einigen.

কোন একটি বাঙলা বইএ আমি এই শ্লোকটি পড়েছিলুম। তার মানে, নানা ভাষা না শিখলে মাতৃভাষারও রস বোধ ঠিক হয় না। কিন্তু তনু এদিকে কান দিল না। আমার হাত থেকে বইএর মোড়কটা নিতে নিতে বলল : কী বই এনেচ দেখি!

চমকে উঠল বইখানা দেখে!

অসমাপ্তিকা। বেরিয়ে গেছে বাজারে!

মুখখানা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হেসে বললুম : চেনো নাকি এ বইএর লেখককে!

আমি চিনব না! গৌরবের সুর ধরা পড়ল তার বলার ধরনে! নাম ভাঁড়িয়ে লিখচ বলেই ভেবেচ ঠকিয়ে দেবে! তোমার গলার স্বরও যেমন চিনি, বলার ধরনও তেমনি জানি। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

এক কৃশাঙ্গী মহিলা বললেন: লুকিয়ে থাকার আশ্চর্য ক্ষমতা আপনার!

এবারে পরিচয় করিয়ে দেবার পালা।

এই মহিলাকে দেখিয়ে তনু বলল: আমাদের মন্টিরাণী। ইনি এঁর পতিদেবতা, মিষ্টার দিলীপ সান্যাল। ইনি মিসেস সেন, ডক্টর সেন ওঁর বিলেতের বন্ধু। মিষ্টার সারভাতের সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধ ছেলেবেলা থেকে। সুধা নিতার বন্ধু, ইকনমিক্সে এও অনার্স নিয়ে পড়চে।

সকলের সঙ্গেই নমস্কার ও শিষ্টাচার বিনিময় হল।

মিসেস সেন আমার লেখার এমন একটা প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করলেন, যা লিখতে সঙ্কোচ বোধ করছি। এত লোকের সামনে হঠাৎ ধরা পড়ে যাব, এ আশঙ্কা নিয়ে আসিনি। তাই চট করে সে কথার উত্তর দিতে পারলুম না।

আমার অভিভূত ভাবটা কাটবার আগেই মন্টিরাণী আরেক মন্তব্য করলেন, বললেন: আমি কিন্তু আপনার লেখার চেয়ে তনুর কাছে আপনার গল্প শুনতেই বেশি ভালবাসি।

এ কথার জবাব দিলেন মিষ্টার সান্যাল, বললেন: ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

তনুর আজ আগ্রহের অন্ত নেই। বলল: এসো বিশুদা, ঘরে আরও অনেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করচেন।

বলে মাঝের বড় বসবার ঘরটায় এক রকম টেনেই আনল।

রঙের হাট বসেছে এখানে। কত বিচিত্র রঙের একত্র সমাবেশে ঘরের সাদা আলোটা পর্যন্ত রঙীন হয়ে উঠেছে। পুরুষেরা কেউ

দিশি কেউ বিদিশি পোষাকে এই রঙের উৎসবে নিজেদের যথাসাধ্য মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। ঘরের নানা স্থান থেকে নানা রকমের গন্ধ আসছে, কোনোটা উগ্র, স্নিগ্ধ কোনোটা। এক পাশে একটা চৌকো টেবিলের ওপর নানা শ্রেণীর জিনিষ প্রখর বিদ্যুতের আলোয় ঝক ঝক করছে। নিতা তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল, আমায় দেখতে পেয়েই ছুটে এল।

উঃ কী আশ্চর্য লোক আপনি বিশুবাবু: সকলকে চমকে দিয়ে নিতা বলল: সেই যে ফেরার হলেন, তারপর আর টিকিটির খোঁজ মিলল না। আপনার মেসে খোঁজ করতে খবর পেলাম শোক পেয়ে আপনি নাকি সন্নাসী হয়ে গেছেন।

উত্তরে শুধু একটু হাসলুম।

নিতা বলল: হাসচেন! লজ্জা পেলেন না এতটুকু?

আরও জোরে জোরে হাসলুম আমি!

অপ্রস্তুত হয়ে নিতা বলল: ভাগ্যিস সন্দেহ করেছিল বৌদি, নইলে আপনার 'ঋষ্যশৃঙ্গ' নাম আর কে টের পেত!

অতিথিদের মধ্যে কে একজন বললেন: একটু ভুল হল মিস শোলাপুরকার। যাঁরা খ্যাতি চান না, খ্যাতি নিজেই তাঁদের টেনে বাইরে আনে। নইলে পৃথিবীর কজন বড়লোক তার খ্যাতি নিয়ে জন্মায়!

একে একে অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হল। বাঙলা সাহিত্যের খবর রাখেন না অনেকে। যাঁরা রাখেন তাঁদের কয়েকজন আমাকে চেনেন। কীভাবে তাঁদের অভিনন্দন জানাবেন, ভেবে পেলেন না কেউ কেউ। দশজনের কাছে শ্রদ্ধা পাব বলে গল্প লিখিনি, লিখেছি

পেটের দায়ে। উপার্জনের জন্য কোনো পন্থা খুঁজে পেলে এমন ধৃষ্টতার কাজ হয়তো করতুম না।

এখানে এসে বিস্ময় বাড়ছে ক্রমে ক্রমে। লেখা আমার পয়সাই শুধু আনেনি, খ্যাতির ক্ষেত্র তৈরি করেছে অলক্ষিতে। আমার প্রাপ্যের অতিরিক্ত দাম পেয়েছে আমার লেখা। উৎসাহ মেয়েদের বেশি। তারা আমার দেহের অনাবশ্যক দীর্ঘতায় আভিজাত্যের ছাপ দেখছে, আমার খদ্দরের আড়ালে প্রতিভা লুকিয়ে রেখেছি বলে সন্দেহ প্রকাশ করছে বার বার। স্বপক্ষে কোনো যুক্তি নেই, বিপক্ষের সকল যুক্তি তবু অচল। মেয়েদের তর্কের রীতি কি এইরকম!

সবাই ফিরে গেলেন, কিন্তু তনু আমায় যেতে দিল না। বলল: তোমার এককড়িদার বৈঠকখানায় আর নাইবা গড়ালে বিশুদা। এ বাড়িটায় তো আমরা থাকি না, গাড়িও আছে একখানা। উনি বলছিলেন, এ বাড়তেই তোমার থাকার ব্যবস্থা ভাল হবে!

কিন্তু—

আর কিন্তু নয় বিশুদা। অনেক জ্বালিয়েচ আমাকে, এবারে একটু শান্তি দাও।

এ কথার জবাব দিতে পারলুম না।

চল।

বলে তনু আমায় টেনে নিয়ে গেল।

দোতলায় একখানা দক্ষিণের ঘরে তারা আমার থাকবার ব্যবস্থা করেছে। ঘরটি নতুন সাজানো। বড় জানালার পাশে একখানা

ছোটখাট, তার বাজুতে নারকেল গাছে বাঁদর-ওঠার ছবি কোঁদা। শিয়রের দিকে একটা টিপয়ের ওপর নীল কাঁচের কুঁজো আর গ্লাস। দেয়ালের দিকে একখানা চৌকি ও লেখবার টেবিল। তার ওপর বাঁকানো রূপোর হাতলে গোলাপী কাঁচের পদ্ম, ভেতরে বাতি জ্বলছে মিট মিট করে। বোঁটার নীচে একটা বোতাম টিপতেই পদ্মের বন্ধ দলগুলো খুলে গিয়ে সারা ঘর উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এক ধারে একখানা আরাম চৌকিও ছিল। সেখানার দিকে অাঙ্গুলি নির্দেশ করে তনু বলল: বোসো।

অনেকক্ষণ একটা কৃত্রিম আবহাওয়ার ভেতর থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। খানিকটা ক্লান্তিও এসেছিল। লক্ষ্মী ছেলের মতো তাই তার আজ্ঞা পালন করলুম।

তনু আমার পাশে হাতলের ওপরেই বসল।

অনেক্ষণ পরে কথা কইল ধীরে ধীরে। বলল: এমন যে হয়েছিল, জানাওনি কেন?

আমি হেসে ফেললুম।

তোমার অহংকার আজও গেল না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগ করল: কোনোদিন যাবেও না।

বছর খানেকের ব্যবধানে আবার দেখা হয়েছে। একটা বর্ষা শেষ হয়ে আরেকটা বর্ষা শেষ হতে চলেছে কলকাতার বালীগঞ্জে। বাইরে কখন জল নেমেছিল জানতে পারিনি। দক্ষিণের জানালা দিয়ে একটা দমকা হাওয়া এসে দুজনকেই এক সঙ্গে কাঁপিয়ে গেল।

আবার জল এল।

বলে তনু জানালাটা বন্ধ করে এল।

আমার মনে পড়ল আরেকটা সন্ধ্যার কথা। এমনি বর্ষা নেমে-ছিল গ্রামের আকাশ ছেয়ে। তনু আমার কাছেই সেদিন এসেছিল, পাশে বসে চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল আস্তে আস্তে। কতো অর্থহীন কথা হয়েছিল সেদিন, কতো অনাবশ্যক কথা।

ভাবছিলুম, সেই কথা তাকে মনে করিয়ে দেব কি ?

পারলুম না।

এক সময় সিঁড়ির ওপর পায়ের শব্দ শোনা গেল! তনু উঠে দাঁড়াল। বলল : নিতারা বোধ হয় আসচে।

ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলুম আরাম-চৌকির পিঠে।

পরদিন বিকেলে চা খেয়ে বার হচ্ছিলুম। নিতা পেছনে ডেকে বলল: খোলা হাওয়ার লোভ যদি আপনার থাকে তো চলুন ছাদে যাওয়া যাক।

নিতার বয়স বছর উনিশেক। রঙটা ফর্সা নয়, একটু কালোর দিকে। চোখ দুটো উজ্জ্বল, একটু চঞ্চল। অকারণেও অনেক হাসতে পারে। ইকনমিক্সটা ওর ভাল লাগে, তাই বি-এতে অনার্স নিয়েছে ইকনমিক্সে। টসিগ হায়াক নিয়েই তার বেশি সময় কাটে। বাকিটা হাসে আর ছুটোছুটি করে। অনেকদিন পরে কলেজ থেকে ছাড়া পেয়েছে। তাই দাদা বৌদি পশ্চিমে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সেও আর শান্তিনিকেতনে ফিরবে না। বাইরের অন্ধকার তার জীবনের আকাশ কালো করেনি, সঙ্গী হিসেবে তার দাম আছে বৈকি! আগ্রহ প্রকাশ করে বললুম: চল না!

পথ দেখিয়ে নিতা ছাদে নিয়ে এল। বেশ পরিষ্কার খোলা ছাদ। মাঝখানে একখানি গোল শ্বেত পাথর বসানো নিচু টেবিল। চারিদিকে খানকয়েক চেয়ার, সবগুলো হাল্কা লোহার। কাজেই বৃষ্টির সময় টানাটানির হাঙ্গামা নেই। জলের ট্যাঙ্কের পাশে আরেকটা ভাঙা ট্যাঙ্ক, মাথাটা কেটে ফেলে তার ভেতর ফুলের চাষ করা হয়েছে। মল্লিকা আর চামেলি তাদের অবলম্বন সুদ্ধ হেলে পড়েছে, বেল শিশু, দুয়েকটা ফুল ফুটে আছে যুঁই এর ভিজে ডালে। টবের ভেতর রজনীগন্ধার একটা শিষ উঠেছে, নীচের দিকে গোটা দুই ফুল

ফুটেছে। এসবের মাঝখানে দেখলুম একটি গোলাপ গাছ, বাঁচবার ব্যর্থ চেষ্টাই তার উৎকট পরিচয়।

ভালো লাগল তাদের এই ছাদটুকু। একখানা চেয়ার টেনে বসবার আয়োজন করলুম।

নিতা আপত্তি জানাল না, আলসের ওপর হাত রেখে সূর্যাস্ত দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই তার মিষ্টি গলায় সুর শুনতে পেলুম, গাইছে—

হারপলে জে তে মাঝে ক্ষণ
দেইল কা কুণি মজসী পরতুন ?

তারপরে আর গাইল না।

চেয়ার ছেড়ে আমি তার পাশে এসে দাঁড়ালাম। বললুম : তারপর ?

নিতা বলল : পুনর্জন্ম আমি চাইনে।

আমি তার গান শুনতে চেয়েছিলুম, তার ভাবনা নয়। নিতা তার গানের মানে বলল আমায় : যত মুহূর্ত হারালাম জীবনে, সে কি কেউ আমায় ফিরিয়ে দেবে ?

বললুম : নতুন মুহূর্ত যে সব জমা আছে, সে কি আরও মধুর হবে না ?

অনেক্ষণ নীরবে কাটল। এক সময় আত্মস্থভাবে নিতা বলল : আপনি নিজের কথা কখনও ভাবেন বিশুবাবু ?

একথা কেন নিতা ? আমি প্রশ্ন করলুম।

বোধ হয় ভাবেন না।

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিতা নিজের কথাই বলল।

আমি হাল্কা সুরে বললুম: কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী।

নিতা বলল: আপনি তো কারো কাছে কিছু চাননি, কোথা থেকে পাবেন! দুঃখ তো আপনার সাজে না।

আমার দুঃখ কিসের?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

নিতা বলল: ঐ বোধটুকু থাকলে লোকে আপনার দাম দিত। যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করা আর ভাগ্য মেনে নেয়া, একই রকমের পরাজয়। পুরুষের ধর্ম এ নয়, নিজের দাবী যে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেয় সেই তো পুরুষ।

আমি এ প্রসঙ্গের মানে বুঝলুম না, শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

দক্ষিণ থেকে এবারে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। নিতা চেয়ে ছিল একখানা নতুন বাড়ির দিকে। এক সময় বলল: ঐ বাড়ি-খানা কার জানেন?

তার দৃষ্টি দেখে চমকে উঠলুম! অন্যমনস্কতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার দু চোখ। অন্যমনস্কতা পাগলের, কল্পনাবিলাসীর আর মনস্বী সাধকের। প্রেমও মানুষকে পাগল করে, অন্যমনস্ক করে। কিন্তু নিতা তো এ সবের কোনো পর্যায়েই পড়ে না। নতুন মনে হল নিতাকে। কথা বলে তার মনের সহজ বিকাশকে বাধা দিলুম না। আষাঢ়ের নবীন মেঘের পথ রোধ করে তার সুধা শ্যামলিমা হারাতে তো চাই না।

নিতা বলল: নির্মাল্যবাবুকে মনে পড়ে? ওখানা ওদেরই নতুন বাড়ি।

বললুম: বিপুল ভূখণ্ড যার অর্থের যোগান দিয়েছে এতকাল, এ তার উপযুক্ত বাড়িই বটে।

ভূখণ্ডই বিপুল, মনটা নয়।

নিতা উত্তর দিল।

বললুম: ছি ছি, এমন কথা কেন ভাবচ নিতা!

আমার কথা যেন শুনতে পায়নি, এমনি ভাবে বলল: ভদ্রলোক আপনার বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু আমি তাকে সইতে পারিনে! কিন্তু কেন পারিনে বলতে পারেন?

কী করে পারব বল!

অসহায়ভাবে আমি উত্তর দিলুম।

নিতা ভাবতে লাগল, বলল: তাই তো, কেন পারিনে!

তার চোখের ভাষায় ও কথার ভঙ্গীতে মনে হল, এই সত্যটুকু আবিষ্কারের চেষ্টায় মন তার উন্মুখ হয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে তার নাগাল পাওয়া যায় না। কথা না বলে তাকে ভাববার অবকাশ দিলুম।

একটা সত্য কথা বলবেন বিশুবাবু?

অনেকক্ষণ পরে নিতা কথা কইল। স্বরে তার মিনতির সুর।

বললুম: বল।

একটু থেমে নিতা বলল: আপনি তাঁকে পছন্দ করেন?

আমি হাসলুম তার প্রশ্ন শুনে। বললুম:

—আমার বন্ধু, আমি পছন্দ করব না?

বাধা দিয়ে নিতা বলল: কিন্তু সেকি বন্ধুর কাজ হয়েছিল?

কোন কাজ?

আমি হাসতে চাইলুম।

এরই মধ্যে ভুলে গেলেন : আশ্চর্য হয়ে নিতা বলল : সেই যে একটা মিথ্যে মামলায় আপনাকে জড়াতে চেয়েছিলেন।

আমি আবার হাসলুম তার কথা শুনে।

দৃঢ়ভাবে নিতা বলল : এতবড় একটা ব্যাপার হেসে আপনি হাল্কা করতে পারবেন না।

কে বললে এসব কথা ?

আমি জানতে চাইলুম।

গম্ভীরভাবে নিতা বলল : সবই জানি আমি, কিন্তু কাউকে বলিনি। নির্মাল্যবাবু যেদিন আপনাকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়ে বিদায় নিলেন, তার দুই দিন পর মেসে আপনার খোঁজে গিয়ে সবই শুনে এসেছিলাম। আপনি তার আগের রাতেই আপনার গাঁয়ের বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন।

এ সব বাজে কথা।

আমি মন্তব্য করলুম।

কিন্তু তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। নিতা জবাব দিল : এ পরিবারের কাছে কিছু বাহাদুরী নেয়াই যদি তাঁর উদ্দেশ্য থেকে থাকে, তো তা সফল হয়েছে পুরোপুরি। ও ঘটনার পর থেকে এ বাড়িতে তাঁর অনেক দাম। বৌদি হয়েছে বৌদি, আর আমি নিতা।

আমি একটা অনুরোধ জানালুম নিতাকে। বললুম : ভুল করে মানুষকে ভালো ভাবো ক্ষতি নেই, কিন্তু ভালো মানুষকে খারাপ ভেবে ভুল করো না!

নিতা আমার কথা শুনে বিরক্ত হল, বলল: ঘরের দুয়োর এঁটে বাইরের আলো আটকানো যায় না বিশুবাবু, অন্ধেরও অনুভূতি আছে।

তবু আমি তার কথার জবাব দিলুম। বললুম: যাকে ভালো বলবার কিছু খুঁজে পাইনে, তাকে মন্দ বলার অধিকার আমাদের কোথায়? তাতে নিজেকেই কি ছোট করা হয় না?

জগতে সকলেই কি এই যুক্তি মেনে চলে?

কঠিনভাবে প্রশ্ন জানাল নিতা।

বললুম: তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, অন্তরে তারা শান্তি পায় কিনা! নিজেকে বড় ভাবার ভেতর গৌরব নেই নিতা, আছে অনেক অশান্তি অনেক বিড়ম্বনা। বড় হবার যে দায়িত্ব, তা বহন করবার শক্তি আমাদের কোথায়! সুখী তো তারাই, যারা 'সবার নিচে সবার পিছে' পড়ে থাকে। নিজেদের আমরা বড় ভাবি বলেই আমাদের দুঃখের শেষ নেই।

বড় বড় চোখে নিতা আমার মুখের দিকে তাকাল। আমার কথাগুলো যেন তার বিশ্বাস হল না। এমনি সব মন-ভুলানো কথা বলে দেশের অনেক লোক আজ জনতার কাছে বাহবা নিচ্ছে।

তবু এ কথার উত্তর দিল না নিতা। সামনের একখানা অসমাপ্ত বাড়ির লোহার পাঁজর কখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। পূর্বের দিগন্ত থেকে তখন ধীরে ধীরে অন্ধকার উঠছে। কাদের দুটো শাদা পায়রা উড়ে এসে জুড়ে বসল।

এক সময় নিচে থেকে বেয়ারা এল উপরে। বসবার ঘরে নির্মাল্য অপেক্ষা করছে, সেই খবর দিয়ে গেল।

নামবার আগ্রহ ছিল না নিতার, তাই বোধ হয় জবাব দিল না। আমিই তাকে টেনে নামালুম।

সিঁড়িতে নিতা বলল: কাল নির্মাল্যবাবু নিজে না এসে লোকের হাতে উপহার পাঠিয়েছিলেন।

বললুম: হয়তো কোনো বিশেষ কাজে আটকা পড়েছিলেন।

নিতা সে কথা মানল না, বলল: আমি এর আড়ালে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি।

এ কথার জবাব দেবার আর সময় পেলুম না।

( ৮ )

বসবার ঘরে নির্মাল্য গল্প করছিল তনুদের সঙ্গে। আমাদের দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল: বিশ্বপতিবাবু কবে এলেন!

প্রশ্নে আবেগ নেই এতটুকু, দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ তলবও করেনি। বললুম: কাল নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে আটকা পড়েচি।

কে আটকালো আপনাকে?

নির্মাল্য ব্যস্ত হল।

হেসে ফেলল তনু, বলল: তোমার ভয় নেই নির্মাল্য। আটকেচি আমি।

নির্মাল্য যথার্থ লজ্জিত হয়ে একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করছিল। বাধা দিয়ে তনু নিজেই বলল: কিন্তু কাল এলে না ভাই, সবাই তোমার খোঁজ করে করে হতাশ হল।

অনুতাপের সুরে নির্মাল্য বলল: তোমার জন্মদিনে উপস্থিত থাকবার আগ্রহ কি কারও চেয়ে আমার কম ছিল বৌদি! কী করব, হঠাৎ বাবা ডেকে পাঠালেন। আজ আবার তাঁরই পত্রবাহক হয়ে আসচি।

বলে পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করে তার হাতে দিল।

বেয়ারা কাছেই দাঁড়িয়েছিল, তনু তাকে চায়ের হুকুম করল।

আমি যাচ্চি।

বলে নিতা বেরিয়ে গেল।

চিঠি পড়ে তনু লাফিয়ে উঠল, বলল : এ তো আমাদের সৌভাগ্যের কথা! তোমার বাবার ইচ্ছে, আমাদের তো কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না!

ডাক্তার শোলাপুরকার বললেন : দেখি দেখি, কী লিখচেন তিনি!

তনু বলল : অঘ্রানের প্রথমেই তিনি বিয়ে দিতে চান।

আমার দিকে ফিরে বলল : তুমিই বল বিশুদা, নির্মাল্যের মতো পাত্র—

কখনই হাতছাড়া করা চলে না।

কথাটা সম্পূর্ণ করলুম আমি।

ডাক্তার শোলাপুরকার তখন গভীর মনোযোগ দিয়ে চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়ছেন।

বললুম : যখন কলেজে পড়ি, আমি ওঁকে উপন্যাসের নায়ক বলতুম, উনি খুশিই হতেন তাতে।

উৎসাহ পেয়ে তনু বলল : ও মেয়েটা আবার গেল কোথায়?

দু হাতে দু থালা খাবার নিয়ে নিতা ঘরে ঢুকছিল, বলল : এই যে বৌদি।

থালা দু খানা আমার সামনে তিপায়ের ওপর কোনো রকমে রেখে মৃদুস্বরে বলল : এ দুটোই আপনার।

নির্মাল্যের খাবার এল বেয়ারার ট্রেতে করে। তাতে ও যেন একটু ক্ষুণ্ণ হল। এক পেয়ালা চা ঢেলে নিয়ে বলল : এইমাত্র খেয়ে আসচি।

ডাক্তার হেসে বললেন : ও ভদ্রলোক এইমাত্র দুবার খেয়েচেন, এবার নিয়ে তিনবার হবে।

নির্মাল্য বলল : ওঁর দেহটাও দেখতে হবে, লম্বায় ও পাশে আমার ঠিক দেড়গুণ।

আমি আমার বাঁ হাতের কড়ের আঙুল কামড়ে বললুম : ছি ছি, এমন করে চোখ দেবেন না সবাই!

তন্নুরা স্বামী স্ত্রীতে এক সঙ্গে হেসে উঠলেন।

নিতা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল : আপনাকে খাইয়ে আনন্দ আছে। যত্ন করে দিলে আপনি ফেলতে পারবেন না জানি।

গল্প গুজবে অনেক রাত হল, কিন্তু নিতা কথা কইল না। নির্মাল্যকে তার বিয়ে করতে হবে, নিঃশব্দে সমস্ত যুক্তি শুনে বলল : একটি রাত আমায় ভাববার সময় দাও, কাল সকালে আমি এর উত্তর দেব।

কাল সকালে আবার আসব।

বলে নির্মাল্য উঠে গেল।

তন্নু বলল : আজ তোমাদের একটা নতুন জিনিষ খাওয়াব। বিশুদাকে খাওয়াতে মা খুব ভাল বাসতেন।

নিশ্চয়ই আপেলের কাষ্টার্ড।

কতকটা নিঃসন্দেহে আমি আমার সন্দেহ জানালুম।

হাসতে হাসতে তন্নু বেরিয়ে গেল।

এক সময় ডাক্তার শোলাপুরকারও বিদায় নিলেন।

ঘরে রইলাম আমি ও নিতা। উঠে গিয়ে সে রেডিওতে একটা স্টেশন ধরল, কণ্ঠে ও যন্ত্রে তারা বিচিত্র সুর ধরেছিল।

অনেকক্ষণ পরে নিত্তা কথা কইল, বলল: আচ্ছা বিশুবাবু, আপনার ইলোরা ভাল বেসেছিল মনীষকে। মনীষের সব আছে—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও হৃদয়, অভাব শুধু অর্থের। আর ইলোরাকে ভাল বাসল যে তার অর্থও আছে। আপনি সেই ধনীর সঙ্গেই দিলেন ইলোরার বিয়ে। কিন্তু জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি কি এই? অর্থ হৃদয়াবেগের যে দ্বন্দ্ব, সে দ্বন্দ্বে কি হৃদয় চিরদিনই পরাজয় মেনে নেবে?

এই চঞ্চল মেয়েটির অন্য একটা রূপ আজ আমার চোখে পড়ল। এখানে তার অনুভূতি তীক্ষ্ণ, প্রকাশ মৌন। আমি মুগ্ধ হলুম। আজ তার অকারণ গাম্ভীর্যে আমি এমনি কোনো দুর্ঘটনার সঙ্কেত পেয়েছিলুম। নিজেকেই অপরাধী মনে হল। তবু বললুম: উপায় ছিল না নিত্তা। হৃদয়ের ওপর অর্থের প্রাধান্য দিয়েছি বলে তোমাদের মতো ভাববিলাসীরা আমার ওপর মারমুখো হয়েচ জানি। কিন্তু বাস্তব তো অন্য জিনিষ। অভাবের রুদ্র মূর্তি যাঁরা নিয়ত দেখচেন, তাঁরা আমাকেই সমর্থন করবেন। নুট হামসুনের হাঙ্গার বইএ দেখোনিকি, মানুষ কেমন করে কসাইএর ফেলে দেয়া হাড় কুকুরের মুখ থেকে ছিনিয়ে খাচ্ছে। তারপর মাঝরাতে নিজের বাড়ি ঢুকচে চোরের মত নিঃশব্দ পদক্ষেপে, পাছে বাড়িওয়ালা জেগে গিয়ে বাড়ি ভাড়ার তাগাদা দেয়। পেটে আহার নেই, চোখে ঘুম নেই, ভোর হবার আগেই তাকে সরে পড়তে হবে।

একটু থেমে বললুম: দুঃখবাদী যদি কেউ এসব দেখে দেখে হৃদয়কে গৌণ করে, এর পরেও কি তুমি তার প্রতিবাদ করবে?

সীতা সাবিত্রীর জীবন আলোচনা করে নিত্তা আমার যুক্তিকে খণ্ডন করল না, মেনেও নিল না। বলল: স্থূল শরীরটার পোষণের

জন্য অন্তরকে বলি দিতে হবে, আপনার এ মত আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না।

বললুম: আমি জানি তুমি পারবে না, কেন না আমি নিজেও একদিন পারিনি। তারপর অভাব এসে যেদিন সোজাসুজি কাঁধের ওপর ভর করল, সেদিনই প্রথম জানলুম যে অভাব কী এবং তাকে কাঁধে করে জীবনের খেলায় কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়। এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই নিতা, দুরকমের দুটো দৃষ্টি ভঙ্গীর মিল কখনও হবে না। যুক্তি দিয়ে তোমাকে হয়তো থামাতে পারি, কিন্তু মানাতে পারব কেন!

তনু ঘরে এল, বলল: আপেল সেদ্ধ হতে বসিয়ে এসেচি, এ সময়টুকু আমার ছুটি।

বললুম: তবে এসো একটা আলোচনা করা যাক!

তনু বলল: বসে বসে আলোচনা করার পক্ষপাতী আমি নই। শীলার বলেন, যারা বেশি ভাবে বা আলোচনা করে তাদের দিয়ে কাজ কিছু হয় না। তুমিও তো শীলার পড়েচ, তোমার মনে নেই?

ডাক্তার শোলাপুরকার শীলারের ভক্ত বলে জানি। বললুম: মনে থাকবে না কেন, কিন্তু ডাক্তার সাহেব দেখচি তোমার মাথাটাও একেবারে খেয়ে বসে আছেন।

আমার মন্তব্যে তনু খুশি হল, হাসি মুখে বলল: আমিই যে খেতে দিয়েচি।

আমারও ভাল লাগল এই সমর্পণটুকু। নিতাকে লক্ষ্য করে বললুম: বুঝলে নিতা, আজ মনে কোরো না যে তোমার এই বৌদিটি নিতান্ত খুশি মনে তোমার দাদাকে বিয়ে করেছিলেন। তবু আজ তামা-তুলসী হাতে নিয়ে শপথ করলেও তোমরা আমায়

মিথ্যেবাদী বলবে। তোমাদের রীতিই এই। বিয়ের আগে ওদের আপত্তি থাকবেই, দিনে দিনে সেটা অপরিহার্য হয়ে উঠছে। বিয়ের কিছুদিন পরে এসে দেখো, নতুন পরিস্থিতির ভেতর এমন সুন্দর মানিয়ে নিয়েছে তারা যে ভাববে এর চেয়ে ভালো মিলন যেন আর কিছু হতে পারত না।

তনু একটু ব্যস্ততার ভান করে বলল: নিতারও কোনো আপত্তি আছে নাকি?

একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে নিতা বলল: তুমিও যেমন বৌদি তাই ঐ পাগলের কথার মানে খুঁজছ!

নিতার উত্তরে তনু খুশি হল, বলল: তাই বল।

আমাকে বলল: দেখো বিশুদা, নির্মাল্যকে এইমাত্র ফোনে জানিয়ে দিলাম যে নিতার কোনো অপত্তিই থাকতে পারে না। সামনের অঘ্রানেই বিয়ে হবে। তাতে নির্মাল্য কী বলল জানো?

আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

বলল: দিন সাতেক পরেই তার বাবা আসবেন কলকাতায়। একটা ভাল দিন দেখে আশীর্বাদটা তখুনি হতে পারে।

আমি একাই আনন্দ প্রকাশ করলুম, নিতা কথা কইল না। তার অসহায় চোখে আত্মবলিদানের বেদনাই বুঝি ফুটে উঠল।

( ৯ )

·· সারারাত্রি অকাতর বর্ষণের পর সকালের মিঠে রোদের খানিকটা আকর্ষণ নিশ্চয়ই আছে। পুব দিকের যে জানালাটা দিয়ে রোদ আসছিল, তারই নিচে একখানা আরাম চৌকি টেনে নিয়ে খবরের কাগজে মন দিয়েছিলুম। ঘরের আর একটা কোণে গোটাচারেক কাঁটা নিয়ে নিতা মোজা বুনছিল তার দাদার জন্যে। বার কতক ভুল হতেই 'দূর ছাই' বলে উঠে পড়ল।

বললুম: কী হল নিতা?

যা হবার তাই হল: রুক্ষস্বরে নিতা জবাব দিল, গোড়ালি বোনা ভুলে গেছি।

ভুলে গেছ, না মন বসচে না?

হেসে প্রশ্ন করলুম আমি।

নিতা জ্বলে উঠল। জ্বলবার কথাই। আগামী সপ্তাহে তার আশীর্বাদের দিন স্থির হবে। তাকে বিয়ে করতে হচ্ছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তার ভালো লেগেছিল যাকে, সে একটা অপদার্থ, হৃদয়াবেগের আবেদন নেই তার কাছে। সেই হৃদয়হীনকে অন্তর থেকে মুছে ফেলতে হলে আরেকজনের নিবিড় সান্নিধ্য চাই প্রতিদিনের জীবন ধারায়। কিন্তু সেই সম্মতি যখন অন্তর থেকে আসে না, চারিপার্শ্বের নিষ্ঠুর জগৎ যখন জোর করে সম্মতি আদায় করে, তাতে আনন্দ নেই, আছে ক্ষত। সামান্য আঘাতেই তা তাজা হয়ে ওঠে। আমি তার অন্তর্দ্বন্দ্বের সবটুকু জেনেও তাকে আঘাত দিলুম।

নিতা ফেটে পড়ল: আপনি কি কিছুতেই সিরিয়াস হতে পারেন না বিশুবাবু?

গম্ভীর হয়ে বললুম: কী করব বল, যঃ স্বভাব হি যস্য স্যাৎ—

ধমক দিয়ে নিতা থামিয়ে দিল, বলল: অপনার শরীরে কি এতটকু লজ্জা নেই!

আরও খানিকটা গাম্ভীর্য সঞ্চয় করে বললুম: ঐ বস্তুটির আমার সবচেয়ে বড় অভাব।

এমন উত্তরের জন্য সে বুঝি প্রস্তুত ছিল না। বলবার মতো কিছু না পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বাধা পেল দরজায় পৌঁছুতেই। নির্মাল্য ঘরে ঢুকছিল। সামনেই নিতাকে দেখে প্রচুর খুশি হল। বলল: তোমার যে আপত্তি হবে না, এ আমি জানতুম।

নিতা কথা কইল না। উত্তর দিলুম আমি। তাকে আরাম দেবার জন্য বললুম: আপত্তির তো একটা সঙ্গত কারণ থাকা চাই নির্মাল্যবাবু। মেয়েরা যা চায়, তার কোনটার অভাব আপনার?

নির্মাল্য নিশ্চিন্ত হল। একখানা চৌকি নিয়ে বসল পাশে। কিন্তু নিতা বসল না। অসহিষ্ণুভাবে পা ফেলে বেরিয়ে গেল।

নির্মাল্য কী একটা বলতে যাচ্ছিল, উৎসাহ হারিয়ে থেমে গেল। আমি বললুম: রাতে আপনি চলে যাবার পর নিতাকে আমি এই কথাই বলছিলুম।

কী জবাব দিল সে?

কথার মাঝখানেই নির্মাল্য প্রশ্ন জানাল।

এই শ্রেণীর লোকের কাছে নিতার অন্তরের কথা প্রকাশ করা চলে না। তাই সত্যকে খানিকটা গোপন করতে হল। বললুম: মেনে তাকে নিতেই হবে। অস্বীকার করবার উপায় কোথায়?

এমন উত্তরের আশা সে করেনি, তাই ক্ষুব্ধ হল খানিকটা। পকেট থেকে সিগারেটের কেস বার করে অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাল একটা।

আমিও চুপ করে রইলুম।

এক সময় নিতা ফিরে এল। একখানা কালো শাড়িতে জড়িয়ে এসেছে তার ক্লান্ত দেহটা। বলল: আপনি কি গাড়িতে এসেছেন নির্মাল্যবাবু?

নির্মাল্য কিছু ভাবছিল, চমকে উঠে বলল: হ্যাঁ। কোথাও বেরুবে নাকি?

আমাকে উপেক্ষা করে নিতা বলল: চলুন না কোথাও ঘুরে আসি।

নির্মাল্যের যেন বিশ্বাস হল না এ কথা। ঠাট্টা করেছে ভেবেও উঠে পড়ল। কতকটা যন্ত্র চালিতের মতো বেরিয়ে গেল নিতার পেছনে পেছনে।

তনু রান্না ঘরে। ডাক্তার বেরিয়ে গেছেন। আমি আবার খবরের কাগজের পাতায় গভীর ভাবে মন দিলুম।

ঘণ্টাখানেক পরে তাদের ফেরার শব্দ পেলুম। কিন্তু কোলাহল উঠল নানা শিষ্টাচারের। যাঁরা ঘরে এলেন তাঁদের ভেতর নির্মাল্য তনু ও নিতা ছাড়াও আরও দুজন মহিলা ছিলেন। তাঁদের কোথাও দেখেছি বলে মনে করতে পারলুম না। নির্মাল্যের কাছেও দেখলুম এঁরা দুজন অপরিচিত।

উঠে দাঁড়িয়ে ছিলুম। আমার দিকে চেয়ে তনু হেসে ফেলল। বলল ঃ আমাদের মাসিমা।

নিতা আমার কানের কাছে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল ঃ মিসেস মুখার্জি।

আর এ নির্মীলা।

তাঁদের পরিচয় সম্পূর্ণ করল তনু।

নিতা আগের মতো করে বলল ঃ মেয়ে!

মাসিমার যা বয়স তাতে তাঁকে এই প্রসাধন ও সাজসজ্জা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবতেই ভাল লাগে। প্রকৃতির অযাচিত সহজ দানের হাতে যখন টান পড়ে, সেই দীনতাকে বাইরের আড়ম্বর দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা বুঝি আরও হাস্যকর। মেয়েটিরও রূপের উগ্রতা আছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে অক্লেশে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা নিয়ে জন্মেছে, এ সত্য সম্বন্ধে সজ্ঞান মনে হল। সুন্দরী নারী যখন আপন সৌন্দর্যে সম্পূর্ণ সচেতন, তার একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে, যে আকর্ষণে তাপসের তপোভঙ্গ হয়েছে, সাধারণ মানুষ ভুলেছে তার সাধনার পথ।

তনু আমারও পরিচয় দিল, বলল ঃ আমার বিশুদা, গল্প লিখে নাম করছেন।

হাত তুলে মাসিমাকে আমি নমস্কার করলুম।

নির্মাল্যকে দেখিয়ে বলল ঃ মস্ত জমিদারের ছেলে নির্মাল্য। চমৎকার ভদ্রলোক।

নির্মল্য দুজনকেই নমস্কার করল, দুজনেরই নমস্কার পেল।

তনু বলল ঃ বিশুদার লেখা তুমি পড়নি মিলু? ওঁর নতুন উপন্যাস 'অসমাপ্তিকা'?

অত্যন্ত সহজ সুরে নিমীলা জবাব দিল, বলল ঃ বাঙলা লেখা পড়বার একদম সময় পাইনে তনুদি। ভালোও লাগে না। শুধু তো এক ঘেয়েমি। খানিকটা বৈচিত্র্য না থাকলে কি সাহিত্য ভাল লাগে!

তনু একবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার চোখের দিকে চেয়ে সাহস পেল না। নির্মাল্য বলল ঃ আমার ধারনাও ঠিক তাই। বাঙলাদেশে যাঁরা লেখেন, তাঁরা পড়েন না। আর যাঁরা পড়েন, তাঁরা লেখেন না। বাঙলা সাহিত্য তাই পচা জলের ডোবা হয়েই রইল, নতুন ভাবের বান ডাকল না এই সাহিত্যে।

উৎসাহ পেয়ে নিমীলা বলল ঃ রুশ সাহিত্যের সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই পরিচয় আছে। অ্যানের যে চরিত্র গড়ে উঠল টলষ্টয়ের হাতে, পারবে আপনার কোনো বাঙালী লেখক তেমন চরিত্র আঁকতে?

নির্মাল্য শরৎচন্দ্রকে টেনে আনল, বলল ঃ নারী চরিত্রে এই রুশভঙ্গী অনুকরণ করেই তো শরৎচন্দ্র নাম কিনলেন।

খুশি হয়ে নিমীলা বলল ঃ বাঙালী লেখকের এ আর একটা গুণ। কথায় কথায় বিদেশী লেখা থেকে তাঁরা ধার করেন। কিন্তু কই, তাঁরা তো আমাদের কিছু ধার করেন না!

নিতা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এইবারে কথা কইল। বলল ঃ কিন্তু বিশুবাবু বলেন—সাহিত্যে চুরির এই দোষটা সর্বদেশে সর্বকালে সমানভাবে চলে আসছে। শেক্সপীয়রের অধিকাংশ নাটকের

গল্পই আকি সেকালে প্রচলিত কোনো না কোনো গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা।

নিমীলা উত্তর দিল : সাড়ে তিনশ বছর আগেই তা সম্ভব হয়েছিল। তারপরে আর এ মনোবৃত্তি আদর পায়নি।

এ কথার উত্তর খুঁজে না পেয়ে নিতা আমার দিকে চাইল করুণ ভাবে। তর্কে যোগ দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না। নিতা আমার নামোল্লেখ না করলে চুপ করেই হয়তো থাকতুম। অনিচ্ছাসত্ত্বে তাই বলতে হল : চুরি আর একঘেঁয়েমি আজও সব দেশে সমান আদর পাচ্ছে। যখন যে দেশে ওঠে একটা কৃষ্টির ঢেউ, তার নোনা জলের ধাক্কা এসে লাগে পাশের দেশে। এমনি করে ভাব বিনিময় হয় দুটো প্রতিবেশী দেশে। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে বাঙলাদেশ। তাই পাশ্চাত্যের ঢেউ এ দেশে পৌঁছতে চিরকালই দেরী হয়েছে। এ হল ভাব বিনিময়, চুরি নয়।

গলাটা একটু পরিষ্কার করে বললুম : একঘেঁয়েমি অন্য জিনিষ। বড় রকমের একটা ঢেউ এসে যখন পারের ওপর আছড়ে পড়ে, তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত কি সে স্থানটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে না? যতক্ষণ আরেকটা ঢেউ না আসচে, বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে?

বিদেশী সাহিত্যে কি এই একঘেঁয়েমি নেই একেবারে?

আস্তে আস্তে প্রশ্ন জানাল নিতা।

বললুম : আছে বৈকি।

একটুখানি ভেবে বললুম : জর্মন ভাষারই তিনখানি নাটক নাও—লেসিঙের 'নাথাম' গেটের 'ইফিজিনি' আর শীলারের 'ডন

কার্লো'। তিন খানিই আয়াস্বিক ট্র্যাজেডি, মনুষ্যত্ব ও সহিষ্ণুতার আদর্শে রচিত। তিনখানিতেই এমন একটি করে দৃশ্য আছে যেখানে একজন স্বেচ্ছাচারী রাজাকে সত্যের বাণী শুনতে হচ্ছে, অথচ সে বাণীর তীক্ষ্ণতা তিনি সহ্য করতে পাচ্ছেন না। এ ছাড়াও 'নাথামের' যে দৃশ্যে জিউস সুলতানকে লজ্জায় ফেলেছে, এবং ডনকার্লোর যে দৃশ্যে মাকুইস পোসু স্পেনের স্বেচ্ছাচারী রাজার অন্তর স্পর্শ করেছেন, এ দুটো দৃশ্যের ভাব ও ভাষাগত মিল দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'নাথাম' যখন লেখা হয়, তখন লেসিঙের বয়স বায়ান্ন বছর। ডনকার্লো লেখা ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, শীলারের বয়স যখন আটাশ।

নিমীলাকে লক্ষ্য করে বললুমঃ আপনি তো বিদেশী সাহিত্য অনেক পড়েচেন, আপনার নিশ্চয়ই এসব জানা আছে।

এ কথার জবাব কেউ দিলেন না। যাঁরা বড় বড় আলোচনা করেন নিজেদের জ্ঞান জাহিরের উদ্দেশ্যে, তাঁদের চেয়ে বেশি জানা কেউ বেরিয়ে পড়লে থেমে পড়তেই তাঁরা ভালবাসেন। একঘর বাঙালীর ভেতর দুটো ফরাসী বুলি কপচে আমরা গর্ব বোধ করি, কিন্তু কেউ ফরাসী জানেন টের পেলে মাতৃভাষা ধরেই আরাম বোধ হয়।

নিমীলা হঠাৎ আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দিল, বলল: আপনার লেখা পড়ার সুযোগ এতদিন হয়নি। এবারে দেশে এসেছি, এবারে সে সৌভাগ্য হবে।

চা খেতে খেতে আরও অনেক কথা হল। প্রকাশ পেল মুখার্জি পরিবার থাকেন আম্বালায়, দেশ কলকাতা। মিষ্টার মুখার্জির প্রথম

জীবন কেটেছে বিলেতে। বিলিতি সমাজের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ, তা তাঁর পরিবারে সংক্রামিত হয়েছে। মেয়ে গুরুজনের পায়ের ধূলো নিতে শেখেনি, শিখেছে সহজ ভাবে কর কম্পন করতে। রবীন্দ্রনাথের গান তার ভালো লাগে না, পিয়ানোর সঙ্গে বিটোফেনের মুনলাইট সোনাটা গায়।

নির্মাল্যের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা তনু মাসিমাকে জানাল, বলল : বিশুদার এম, এ ক্লাসের বন্ধু। কিন্তু নিজেদের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধের কথা জানাল না। বিয়ে পাকাপাকি হবার আগে লোক জানাতে মেয়েরা ভয় পান।

ওঠবার আগে মাসিমা বললেন : পরশু একটু চায়ের আয়োজন করতে চাই তনু, এসো তোমরা।

একটু থেমে বললেন : বাইরের লোক কেউ থাকবেন না। তোমরাই সব। বলে আমাদের দিকেও চাইলেন।

নির্মাল্য ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

আমাকে বললেন : আপনার যদি বিশেষ কাজ না থাকে তো আসুন না আমাদের সঙ্গে।

ভাল না লাগলেও বললুম : বেকারের আবার কাজ কি।

নিমীলাকে শুনিয়ে তনু বলল : সুন্দর মুখ দেখে আমাদের যেন ভুলে যেও না বিশুদা !

মাসিমা তখন বারন্দায় পৌঁছেছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে নিতা বলল : বিশুবাবুকে খাওয়াবার ইচ্ছে থাকলে পাঁচ জনের খাবার বেশি রাখবেন মাসিমা ; ওঁর দেহটাতো দেখচেন !

নিতার কণ্ঠে সেই পুরনো সুর, আনন্দের লালিমাটুকুও ধরা পড়ল।

বাঁ হাতের কড়ে আঙুল কামড়ে বললুম : আবার চোখ দিচ্ছ তো!

নিতা বলল : ওর আধখানা কমলেও যা থাকবে, তাও অনেকের চেয়ে বেশি।

বলে নির্মাল্যের দিকে তাকাল।

হাসল সবাই।

খান তিনেক বাড়ি পেরিয়ে একটু মোড় ঘুরে ছু নম্বরের বাড়ি নির্মাল্যদের। এইটুকু পথ হাঁটতেই মা মেয়ে দুজনেই হাঁপিয়ে উঠলেন। গাড়ির অভাব বোধ করতে লাগলেন পায়ে পায়ে।

নির্মাল্য তার নিজের গাড়িতে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল, তনু তাকে ধরে রাখল কাজের অছিলায়।

মাসিমা আলাপ শুরু করলেন আমার বই নিয়ে। বললেন: সৃষ্টি ছাড়া মুলুকে থাকি, আপনার লেখার খবর অতদূর পৌঁছল না।

বললুম: সত্যিই তো, দেশেই পরিচিত হতে পারলুম না ভালো করে, তো বিদেশে। লেখার অতো শক্তি আমার নেই।

মাসিমা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন: না না, আমি তা বলচি না। আমি বলচি আমাদের নিজেদের কথা। আমার মেয়ে দেখচেন তো, উনিও অমনি। রাশি রাশি বিলিতি কাগজ যত জড়ো হচ্চে, বাঙলার প্রতি বিতৃষ্ণাও তত বাড়চে!

বাড়ির ঝাড়া মোছা তখনও চলছে। বসবার ঘরে পৌঁছে মাসিমা চাকরদের থামতে বললেন। আমাকে বললেন: বসুন।

নিজেও একখানা চৌকি দখল করে বললেন: কাল সকালে এসে পৌঁছেচি, লোকজনের অভাবে এখনও সব গুছিয়ে উঠতে পারিনি। ইনি ছুটি পেলেন না। আদ্ধেক বেয়ারা খানসামা তাঁর জন্যই রেখে আসতে হল।

এমন পরিবারের সঙ্গে আমার আগের পরিচয় নেই। বাঙলা উপন্যাসে যে সব চরিত্র দেখচি, অতিরঞ্জিত বলে সত্যের মূল্য তাকে দিইনি। এবারে বুঝি তাই যাচাই করে নেবার পালা।

নিমীলা বলল: এতোটা পথ একা আসতে মা তো ভয়ই পেয়েছিলেন।

মাসিমা বললেন: মিলুই আমায় নিয়ে এল। বললে: 'পুরুষেরা একা যায় না? আমরা কিসে তাদের চেয়ে ছোট?'

বললুম: তা বটে। মনে যদি দৃঢ়তা থাকে, দেহের শক্তির বেশি দরকার হয় না।

মাসিমা বললেন: একটু চা হবে বিশ্বপতিবাবু?

নিমীলা বলল: কিম্বা কফি?

এসবে আপত্তি করার অভ্যাস আমার নেই। বললুম: মন্দ কি!

চায়ের হুকুম হল। নিমীলা বলল: সঙ্গে কিছু স্যাণ্ডউইচ দিও।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই চা ও স্যাণ্ডউইচ এল। স্যাণ্ডউইচ কোনোটা শশার, মাংসের কোনোটা। নিমীলা চা ফিরিয়ে দিল, তার জন্যে কফি এল ছোট রূপোর পেয়ালায়।

নানা কথা হল, কাজের কথার চেয়ে বাজে কথাই বেশি। আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতের চেয়ে সকল বিষয়ে কেন পিছিয়ে আছি, দুর্বলতা আমাদের জাতীয় জীবনে এসেছে কোন দ্বারপথে, আর এ সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে কীভাবে আমরা মানুষ হতে পারব—স্বল্প পরিসরের ভেতর এ সবের সহজ মীমাংসা হয়ে গেল। আলাপ আলোচনায় নিমীলার উৎসাহই বেশি দেখলুম।

একসময় মাসিমা নিমীলার বিয়ের কথা পাড়লেন। বললেন : সামনের অঘ্রানেই মিলুর বিয়ে ঠিক করেছিলুম, কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন।

ভ্রূকুঞ্চিত করে নিমীলা বলল : ও স্কাউনড্রেলের নাম আর মুখে এনো না মা।

আমি চমকে উঠলুম।

মাসিমা সে কথায় কান না দিয়ে বললেন : ছেলেটিকে সৎ বলেই জানতুম আমরা। ইউ পির একটা পাহাড়ী জায়গায় চুণের কারবার করে। উপার্জন তেমন বেশি নয়, কিন্তু বিলেত ফেরৎ। ভদ্রতা জানে, ভদ্র সমাজে মিশতে শিখেছে। বিনয়ী ও বুদ্ধিমান। এই সব দেখে শুনে মিষ্টার মুখার্জি তার সঙ্গে মিলুর বিয়ে ঠিক করলেন। কিন্তু সে যে একটা কতো বড় ইম্পষ্টার তা প্রকাশ পেল এই সেদিন।

একটা বেয়াড়া দুর্ঘটনার আশঙ্কায় বিব্রত বোধ করলুম।

দাঁতে দাঁত চেপে নিমীলা বলল : একটা টি. বি. পেশেণ্ট রোগ ভাঁড়িয়ে প্রেম করতে আসত।

তার উক্তির নগ্নতায় আবার চমকে উঠলুম।

মাসিমা বললেন : কাশীটা তার বরাবরই ছিল। মিলুকে নাকি বলত, বেশি সিগারেট খাওয়ার জন্যেই এই কাশী হচ্ছে। আমরা তাই বিশ্বাস করেছিলুম। কিন্তু গলা দিয়ে যখন তার রক্ত উঠতে লাগল, তখন তো আর চুপ করে থাকা যায় না! মিলু আড়ালেই রইল, আমিই তাকে শুনিয়ে দিলুম।

নিমীলা বলল : লোকটা এতবড় নির্লজ্জ, সেদিন চিঠি লিখেছিল

একখানা। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসছে, তাই জানিয়ে।

আমি কী বলব ভেবে পেলুম না। মাসিমাই কথা কইলেন, বললেন : যাক, যা কপালে ছিল হয়েছে। এবারে একটি সৎপাত্র দেখে মিলুর বিয়েটা আপনারাই দিয়ে দিন।

নিমীলা গর্জন করে উঠল, বলল : একবারে তোমার শিক্ষা হয়নি মা ?

মাসিমা বললেন : কিন্তু বিয়ে তো একটা করতে হবে।

আমার মতো অপরিচিত একজনকে ডেকে আনার তাৎপর্য এবারে খানিকটা বুঝতে পারলুম। বললুম : কিন্তু আপনারা যে রকম পাত্র চান—

কথার মাঝখানেই মাসিমা প্রশ্ন করে বসলেন : নির্মাল্য কি অবিবাহিত, কেমন ছেলে সে ?

খানিকটা আগে এই প্রশ্নেরই প্রত্যাশা করেছিলুম, কিন্তু উত্তরের জন্য প্রস্তুত হইনি। পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তনুর আগ্রহ ও নির্মাল্যের ভয়ের পাশেই নিতার অসহায় মুখখানিও দেখতে পেলুম। অপ্রকৃতিস্থের মতো মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : চমৎকার ছেলে। মস্ত জমিদারের একমাত্র উত্তরাধিকারী। শিক্ষায় ও সৌজন্যে তার তুলনা নেই।

নির্মাল্য সম্বন্ধে আরও অনেক প্রশ্ন মাসিমা করলেন। কী একটা নেশার ঘোরে আমিও সব প্রশ্নের উত্তর দিলুম। এমন আমার কথনো হয়নি। চমক ভাঙল মাসিমার শেষ কথায়, বললেন : কথাটা তাহলে আপনাকেই পাড়তে হবে বিশ্বপতিবাবু!

আপত্তি করতে গেলুম, বাধা দিয়ে মাসিমা বললেন: না না, আপনি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে এ কাজ হবে না। আপনার সঙ্গে পরিচয় নতুন হলেও বুঝতে পারছি, বন্ধু চিনতে আমাদের ভুল হয়নি।

নিমীলা নিজে আমায় এগিয়ে দিয়ে গেল।

রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে একটা দুরন্ত ক্লান্তিতে দেহটা অবশ হয়ে এল। দেহ বস্তুটির ভার বেশি নয়, তাকে বহন করে যে মন সে ক্লান্ত না হলেই দেহ সচল থাকে। আমার মনও আজ ক্লান্ত হয়েছে।

কোনো রকমে আরাম চৌকিতে এলিয়ে পড়তেই বুঝতে পারলুম কে একজন আমার কাজের সমালোচনা করছে। আমার অনেক দিনের চেনা সে লোক। চোখে তাকে দেখতে পাইনে। মন দিয়ে তাকে অনুভব করি। একদিন যা কিছু সবুজ ছিল আমার অন্তরে নির্দয় হাতে সে তা কেড়ে নিয়েছে, যৌবনটাকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে। তার হাতের ছোঁয়ায় আমার মত্ততার দিন হয়েছে সমুদ্রের মতো স্থির গম্ভীর। জলের ওপরেই শুধু একটুখানি তরঙ্গ ভঙ্গ।

মনে হল, এ কোন পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লুম! এর চেয়ে যে আমার নির্বাসন ভালো ছিল। এককড়িদার বৈঠকখানায় বিশ্রাম না থাক, মনুষ্যত্বের পরীক্ষা আমায় দিতে হত না। এ আমার সুখ নয়, এ আমার শাস্তি! এখান থেকে পালিয়ে আমায় বাঁচতে হবে।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। এক সময় দরজা খুলে বাইরে এলুম। উদার আকাশের লোভে এলুম দক্ষিণের ব্যালকনিতে। বাইরে অন্ধকার রাত বর্ষার মেঘের মতো থম থম করছে। স্তব্ধ রাতের এই ধ্যানগম্ভীর মূর্তির সঙ্গে আপন অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন সামঞ্জস্য

খুঁজে পেলুম না। এ যেন এক ঘুমন্ত দেহীর বুকের ভেতর হৃদযন্ত্রের সক্রিয় চাঞ্চল্য।

পাশে ডাক শুনে চমকে উঠলুম। ব্যালকনির আরেক প্রান্তে তনুকে দেখলুম আমারই মতো দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কাছে গেলুম। তনু কথা কইল না।

বললুম: আমায় ডাকছিলে?

হ্যাঁ।

বলে সে চুপ করে রইল।

কাছেই একটা বড় ঘড়ি টকটক করে শব্দ করছিল অবিশ্রান্ত ভাবে। এবারে নানা রকমের বাজনা শেষ করে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। আর একটা ঘর থেকে পড়ার শব্দ আসছিল। ডাক্তার শোলাপুরকার জর্মন নাটক পড়ছেন।

অনেকক্ষণের নিস্তব্ধতা ভেঙে তনু হঠাৎ প্রশ্ন করল: তোমায় কে বলল যে আমি সুখী হতে পারিনি?

আশ্চর্য হয়ে বললুম: সে কি, তোমার সম্বন্ধে যে এমন কথা কেউ ভাবতেই পারে না তনু!

তবে তুমি জানলে কী করে?

তনু আবার জানতে চাইল।

এ অনুরোধের জবাব নেই, বললুম: কেন একথা বলচ বলতো?

তোমার উপন্যাসে দেখলুম: তনু বলল: ইলোরা বিয়ে করল, কিন্তু সুখী হতে পারল না! কত নিঃসঙ্গ রাত্রি জাগরণের কথা, কত ব্যর্থ অশ্রু বিসর্জনের কথা লিখেছ। সে কি আমাকেই লক্ষ্য করে

নয়? আমিই কি তোমার ইলোরার মতো এক জয়শঙ্করকে বিয়ে করে আজ ক্ষতির হিসেব করছি না?

আর অগ্রসর হতে দিলে তন্নু হয়তো ভেঙে পড়বে। বাধা দিয়ে ডাকলুম: তন্নু!

বল।

তন্নু উত্তর দিল। তার গলার স্বর নেমে এল খাদে। অনেকক্ষণের ঝড়ের পর থম থমে নিস্তব্ধতার মত নিবিড়।

বললুম: চল ঘরে যাই।

উত্তর না দিয়ে তন্নু তার দোতলার বসবার ঘরে ফিরে এল।

আমার ঘরে না গিয়ে এখানে আসার কারণ বুঝতে পারি। মেয়েদের এটা স্বজ্ঞা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির আলো বাতাসের মতো মেয়েরা এ জ্ঞান পায়। আজকের এই আবেগও তার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

আমার কাছ থেকে অনেকটা দূরে তন্নু একটা শক্ত চেয়ারে বসল। বলল: তোমরা ভাবো আমার দুঃখ কিসের! শিক্ষিত ভদ্র সুপুরুষ স্বামী পেয়েচি, অর্থের অভাব নেই বরং প্রাচুর্য আছে, পরাধীন নই—নিজের ইচ্ছেকে প্রতি পদে সংহত করে চলতে হয় না। তবে আমার দুঃখ কিসের? কিন্তু বিশুদা, তোমরা পুরুষেরা কি অন্ধ? কিছুই কি নিজের চোখে দেখতে পাও না?

বললুম: অমন হাসিখুসি আমুদে লোক ডাক্তার শোলাপুরকার। তিনি যে কাউকে দুঃখ দিতে পারেন, সেকথা আমার বিশ্বাস হয় না তন্নু!

তনু বলল : দুঃখ তো এই জন্যই বিশুদা। সবাই ভাবে, আমি কতো সুখী। তারা সুখী দম্পতির উদাহরণ করেছে আমাদের। কিন্তু কেউ জানে না, আমার এই দীর্ঘ রাতগুলো কাটে কী করে! ওর পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছ না বিশুদা? অমনি নিঃসঙ্গ থাকতে চায় লোকটা। নিভৃতে তাকে সেবার অধিকার আজও দিল না। জীবনের দরজাটা ওর আধখানা খুলে রেখেছে, সম্পূর্ণ করে খুলে দিল না। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে তার ভেতরের রূপ দেখছি, অন্তরে আশ্রয় পেলাম না। মেয়েদের জীবনে এর চেয়ে বড় অভিশাপ আর কী আছে বল!

আমি নিঃশব্দে তার কথা মেনে নিলুম। নিজেকেই খানিকটা অপরাধী মনে হল। জীবনের এ দিকটা হয় তো সে কোন দিন ভেবে দেখেনি। আমার লেখায় তার নজর পড়েছে। যতই ভাবছে, ততই বিষিয়ে উঠছে তার মন। দুঃখের কারণ সব সময় চোখে পড়ে না! কারও ধরিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে। একদা কলম্বস যখন মুরগীর ডিম টেবিলের ওপর দাঁড় করাতে বললেন, 'অসম্ভব' বলে সবাই তাঁর কথা উড়িয়ে দিলেন। তারপর ডিমের তলাটি ঠুকে যখন সত্যিই তিনি সেটা দাঁড় করালেন, তখন সবাই বললেন, 'সকলেই এ কাজ পারে।' আমাদের মধ্যেও এই দৃষ্টির অভাব, কেউ দেখিয়ে দিলে তবে দেখতে পাই।

তনু আমার লেখার ভেতর হয়তো সত্যের ছাপ দেখেছে। আমি কল্পনা করে যা লিখলুম, তার খানিকটা হয়তো মিলে গেছে তার বাস্তব জীবনের সঙ্গে। এমন হবে জানলে আমি কি লিখতুম?

তনু বলল : তুমি হয়তো ভাবছ বিশুদা, আজ আমার মাথার ঠিক নেই। ভাবচ, অন্ধকারের নেশা লেগেচে আমার মনে।

কিন্তু সত্যি বলচি, তোমাকে, মাতালের স্বর্গ রচনা এ নয়, শুঁড়ির মদ বেচার মতোই খাঁটি কথা আমি বলচি।

আমি চুপ করে রইলুম।

তনু বলল: আমার কী মনে হয় জানো বিশুদা? আমি বাঙালী বলেই বোধ হয় ও আমার কাছে টেনে নিতে পারল না।

তীব্র আলোকে সারা ঘরখানা হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দুজনেই এক সঙ্গে চমকে ফিরে চাইলুম। ডাক্তার শোলাপুরকার ঘরে এসেছেন। হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকেই হেসে ফেললেন, বললেন: আপনি!

আমি কিছু বলবার আগেই বাতি নিবিয়ে বিদায় নিলেন।

তনু বলল: দেখলে তো বিশুদা, কেমন করে আমার রাত কাটে! তোমাদের মতো আমরা তো আর কলকাতায় থাকি না, যেখানে ভাল না লাগলেও ভালো লাগানো যায়! আমরা থাকি দেওঘরে, আনন্দ পেতে হলে যেখানে নিজের মনটাকেই ঐ সুরে বাঁধতে হবে। বাইরের তরঙ্গ এসে হৃদয়ে আঘাত করবে না। সেখানে ও সারাদিন কাটাবে রোগী আর জমিদারী দেখে, অবসর সময়ে করবে সাহিত্য চর্চা। কিছুই যে চায় না, জোর করে তাকে দিতে যাওয়া তো বিড়ম্বনা। আমি কী নিয়ে বাঁচি বল তো?

তনু আজ থামতে চাইছে না, বলল: আমার বাড়ির সামনে দিয়ে কতো মেয়ে পুরুষ যায়, মন্দির দর্শনে। কারও লাল পাড় শাড়ী, কারও সাদা থান কাপড়। কারও মাথায় ঘোমটা, কারও শুধু মাথা। কারও ঘোমটা আছে সিঁদুর নেই, কারও বা দুইই

আছে। যারা সদ্য স্নান সেরে কালো চুলের রাশ ঘোমটার পাশ দিয়ে পিঠের ওপর ছড়িয়ে, বাঁ হাতে ফুলের সাজি আর ডান হাতে গঙ্গা জলের কমণ্ডলু নিয়ে মন্দিরে যায় মেয়ের সঙ্গে, তাদের আমার ভাল লাগে। এদের অনেককেই আমি চিনে ফেলেচি, এরা ছুটির দিনে মন্দিরে যায় সখ করে। কিন্তু যাদের এই ব্রত পূজো মন্দির যাওয়া কঠোর কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে হয়েছে, তাদের দেখলে আমার ভয় হয়। তাদের মাথার চুল পুরুষ মানুষের মতো ছোট করে ছাঁটা। শীর্ণ শরীরটা শাদা গরদে জড়িয়ে কখনো একা কখনো দু চারজনে মিলে তারা মন্দিরে যায়। তাদের আসতে দেখলে আমি চোখ বুঁজে থাকি, কখনো রান্নাঘরে পালিয়ে যাই।

এখানে হেঁটে বেড়াবার একটা আনন্দ আছে। যারা হাওয়া বদলের জন্য আসে, আর যারা এখানকার অধিবাসী, দু দলই এখানে হেঁটে বেড়ায়। পুরুষ মানুষ সঙ্গে না থাকলেও দোষের নয়, দু পাঁচ বাড়ির পরিচিত অপরিচিত নানা বয়সের মেয়েরা যদি এক সঙ্গে কলরব করে হেঁটে বেড়ায়, তাতে কেউ কিছু মনে করে না। একা বেড়াতে আমার ভাল লাগে না, ওরও সময় হয় না। ক্বচিৎ কখনো সময় হলে আমরা 'জলসার' ধার ঘেঁষে পোড়ো বাড়িটার সামনে দিয়ে সোজা চলে যাই 'বিদ্যাপীঠের' মাঠে। সেখানে ছেলেরা কেউ খেলচে, কেউ বসে আছে, কেউ বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। যে রাস্তাটা 'নন্দন পাহাড়ের' কোল ঘেঁষে সহরের দিকে গেছে, সেইটি ধরে চলতে ও শীলার থেকে আবৃত্তি শোনায়, শোনায় গেটে থেকে। ফস্টাস যেখানে মার্গারেটকে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য অনুরোধ করছে, সেখানটা শোনাতে আমায় ভালবাসে।......

আমি ভাবছিলুম অন্য কথা। অন্ধকারের ভেতর এই মেয়েটির ক্ষত স্থান এখনো দেখতে পাইনি। তাদের স্বামী স্ত্রীর ভেতর যে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে, তা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু সে দূরত্ব ভেঙে ফেলবার তো কোনো বাধা নেই তাদের। ডাক্তার যদি তাঁর নিজের কাজে অমন ডুবে না থাকতো, তাহলে এই সত্যটা হয়তো তাঁর কাছেও ধরা পড়ত। ধরা পড়ত তনুর ব্যথা কোথায়, কেন তার এই অতৃপ্তি।

তনু অনেকক্ষণ থেমে ছিল। আবার কথা কইল, বলল: তুমি আমায় বিশ্বাস কর বিশুদা, আমি বাঙালী বলেই বোধ হয় সে আমায় স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পাচ্ছে না।

কিন্তু আমি তার কথা বিশ্বাস করতে পারলুম না। বললুম: চল আজ শুয়ে পড়ি। কাল আমি তোমার সব কথার জবাব দেব।

আমায় ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে তনু বলল: তোমাকে বিশ্বাস নেই বিশুদা, বিপদে পড়লেই তুমি পালিয়ে যাও। আমি আজ বাইরে থেকে তোমায় বন্ধ করে যাচ্ছি।

বলে দরজার শেকলটা তুলে দিল।

বাইরে তখন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছিল। দেখতে দেখতেই বৃষ্টি আবার চেপে এল।

সকালবেলা নিতার ডাকে ঘুম ভাঙল। খোলা জানালা দিয়ে সোনালি রোদ এসে ঘর তখন ভরে গেছে।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নিতা বলল: আজ কি আপনারা কেউই উঠবেন না স্থির করেছেন? দাদা বেরিয়ে গেছেন ভোর-বেলায়, সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারবেন না বলে গেছেন। বৌদি পড়ে আছেন জ্বরে। আপনারও সাড়া নেই। ব্যাপার কী বলুন তো?

বললুম: আমাকে তো বন্দী করে রাখা হয়েছে, মুক্তি পেলেই বেরতে পারি।

তবে বেরিয়ে আসুন, খুলে দিচ্ছি!

হাসতে হাসতে নিতা জবাব দিল।

আজ তনুর ঘরে চা খাবার ডাক পড়ল। রূপোলি লেসের পর্দা দরজার দু পাশের বাঁকানো পেতলের হাতলে দু ভাগ করে বাঁধতে বাঁধতে নিতা ডাকল: রোগীর ঘরে ডাক পড়েচে বিশুবাবু, প্রাণের ভয় না থাকলে প্রাতরাশটা আজ এখানেই সেরে নিন।

ঘরে ঢুকতেই তনু বলল: আমার প্রশ্নের জবাব দিলে কই?

একটা হাতির দাঁত বসানো চন্দন কাঠের তিপায়ের ওপর বেয়ারা এসে চায়ের সরঞ্জাম রাখছিল। চিনেমাটির ওপর পাঁশুটে কালিতে

বলাকা ওড়ার ছবি আঁকা। চা ঢেলে দিতে দিতে নিতা বলল : বৌদির দেহের উত্তাপ কমেছে, কিন্তু মনের উত্তাপ পড়েনি।

তনুর কথার জবাব না দিয়ে নিতাকেই প্রশ্ন করলুম : জ্বরটা এল কখন ?

কী জানি : নিতা উত্তর দিল : বোধ হয় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজেচেন অনেকক্ষণ! তার ওপর দাদা আমার সকাল-বেলাতেই গেছেন বেরিয়ে। মেজাজের আর দোষ কি!

নিতার কথার ধরনে না হেসে পারলুম না, বললুম : সত্যিই তো এমন সাংঘাতিক অপরাধ করে গেছেন ডাক্তার সাহেব, ফিরে এলেই আমি ধমকে দেব।

তীব্র কণ্ঠে তনু বলল : আমার কথার জবাব তাহলে দেবে না বল!

বল কি! আমি উত্তর দিলুম : সারা রাত জেগে যে উত্তর ঠিক করে রেখেচি।

আমার কথার ধরনে নিতা হেসে উঠল।

গম্ভীর হয়ে বললুম : দেখ তনু, বাজার থেকে বেশ বড় একটা আলুর পুতুল কিনে আন। রোজ সেটা ধোয়াবে, মোছাবে, জামা পরাবে। খাওয়াবে চারবেলা আর ঘুম পাড়াবে বুকের ভেতর নিয়ে। তোমার দুঃখ আছে, এ কথা ভাববার আর অবসরই পাবে না।

নিতা হেসে উঠল খিল খিল করে, ওপাশে মুখ ফিরিয়ে শুলো তনু।

বললুম : বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? জিজ্ঞেস কোরো ডাক্তার সাহেবকে, তিনিও এই বুদ্ধি দেবেন।

রাগ করে তনু দুপুরে কিছুই খেল না। সাধাসাধি করতে গিয়ে নিতা ধমক খেয়ে ফিরে এল। আমার সাহসই হল না ও পর্যন্ত যেতে। বললুম : নিতা, আমরা তখন ঠাট্টা না করলে—

বাধা দিয়ে নিতা বলল : রাগটা যে আমাদের ওপর নয়, তাও বোঝেন নি। ওটা দাদার ওপর। বৌদির চটতেও সময় লাগে না, খুশি হতেও দেরী হয় না।

তারই সঙ্গে যোগ করল : কিন্তু আপনারা পুরুষ মানুষরা ভারি বোকা, বুঝিয়ে না বললে কিছুই বুঝতে পারেন না।

ইঙ্গিতটা তার সত্যিই বুঝলুম না।

দুপুরবেলা এক গাদা বই নিয়ে নিতা আমার ঘরে এল। ধপাস করে সেগুলো বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে বলল : বৌদির কাছে শুনেছি আপনি ইকনমিক্সের এম-এ।

নিতা তনুর অল্প ছোট। দায়িত্ব নেবার প্রয়োজন হয়নি বলে তার ছেলেমানুষিটা আজও ছাড়তে পারেনি! আমার মন ছিল দুঃস্বপ্নের রাজ্যে। বললুম ইকনমিক্স আজ থাক নিতা, ও আরেক দিন হবে।

বৌদি না খেয়ে আছে বলে তার মনটাও বোধ হয় ভাল ছিল না। রাজী হয়ে বলল : তাই থাক। আজ আপনি একটা গল্প বলুন।

কী গল্প বলব ?

আমি জানতে চাইলুম।

বইগুলো এক ধারে সরিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল নিতা, বলল : নিজের গল্পই না হয় বলুন।

আমি হাসলুম তার কথা শুনে।

আচ্ছা বিশুবাবু, নিতা প্রশ্ন করল : বৌদির সঙ্গে আপনার পরিচয় হয় কী করে?

বললুম : ঘটনাটা সাধারণ। তোমার বৌদির রায় বাহাদুর বাবা বদলি হয়ে এলেন আমাদেরই পাশের বাড়িতে। একদিন দু বাড়ির মাঝখানের নিচু পাঁচিল টপকে তোমার বৌদিদের ফলসা গাছে উঠেছিলুম। তলায় দাঁড়িয়ে ফলসা পাবার জন্যে খাতির করে তোমার বৌদি আমায় দাদা বলতে শুরু করল। ওদের আরও ছিল অনেক গাছ—কামরাঙ্গা, জামরুল, করমচা। কাজেই ভাব জমতে আর সময় লাগে কতো।

নিতা হেসে উঠল জোরে জোরে, কী একটা বলতেও যাচ্ছিল। কিন্তু বেয়ারা এসে রসভঙ্গ করল, বলল, ডন্নু তাকে ডাকছে।

একটু বসুন : নিতা বলে গেল : ফিরে এসে বাকি গল্পটা শুনব।

কিন্তু বাকিটুকু অবে তার শোনা হল না। ফিরে এসে বলল : বৌদি আজ উঠতে পারবে না, আপনাদের জল খাওয়ানোর ভার আজ আমার ওপর! উঃ তিনটে যে বেজে গেছে, আমার তো মরবার ফুরসত নেই তাহলে।

বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলা তার দাদা ফিরে আসতেই নিতা একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, বলল : আজ তুমি সারাদিন বাড়ি নেই দাদা, এদিকে

বৌদির কী ভীষণ জ্বর! আমরা ভেবেই অস্থির। কিছু খায়নি সারাদিন, কী করে যে দুপুরটা কাটল!

শেষটায় 'ইতি গজর' মত করে বলল: এখন বোধ হয় জ্বর আর নেই!

পোষাক না ছেড়েই ডাক্তার শোলাপুরকার তনুর ঘরের দিকে ছুটে গেলেন।

নিতা ফিস্ ফিস্ করে আমাকে বলল: বৌদিকে এদিকে বলে রেখেছি যে সারাদিন খাওয়া হয়নি দাদার।

মিনিট কয়েক পরেই কাঁধে তোয়ালে কাপড় ফেলে হাসতে হাসতে তনু বেরিয়ে এল। বলল: তোমার খেয়ে নিশ্চয়ই পেট ভরেনি আজ। একটু অপেক্ষা কর, স্নানটা চট করে সেরে নিয়ে ভালো করে খাইয়ে দিচ্চি তোমাদের।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: ব্যাপার কি তনু, জ্বরের ওপর স্নান করবে নাকি?

হাসি না থামিয়েই তনু বলল: ডাক্তার বললেন, মনের উত্তাপেই দেহটা নাকি গরম হয়েছিল, ঠাণ্ডা জলে স্নান করলেই সব সেরে যাবে।

ওপাশ থেকে খিল খিল করে নিতা হেসে উঠল।

( ১৩ )

পরদিন বিকেলে মিসেস মুখার্জির বাড়িতে আমরা মিলিত হলুম। প্রচুর আগ্রহ নিয়ে ভদ্রমহিলা বাইরের রাস্তায় পায়চারি করছিলেন। দূর থেকে তনুরা তাঁর বেশবিন্যাস লক্ষ্য করেছে, আমি দেখছি তাঁর ব্যস্ততা। জুতো পরা পা দুটিতে প্রতীক্ষার আগ্রহ ছিল জড়িয়ে। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বসবার ঘরে এনে বসালেন।

নির্মীলাকে দেখা গেল না। চারিদিকে একটা দৃষ্টিক্ষেপ করেই তনু প্রশ্ন জানিয়ে দিল : মিলু কোথায় মাসিমা ?

মাসিমা বোধ হয় এমনি একটা প্রশ্নের আশঙ্কা করেছিলেন। খানিকটা সহজ হবার চেষ্টা করে বললেন : একটু বাইরে গেছে, এখুনি ফিরবে।

কৈফিয়ৎটা বোধ হয় সম্পূর্ণ হল না। তাই তখুনি যোগ করলেন : আমিই পাঠিয়েছি তাকে। তোমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছি নির্মাল্যবাবুকে, পাছে না আসেন তাই ধরে আনতে পাঠিয়েছি। ঠিক করিনি ?

মাসিমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি সমর্থন করতে যাচ্ছিলুম তাঁর দূরদর্শিতার, কিন্তু তনুর চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেলুম। তার দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা ছিল। কৌতুক দেখলুম নিতার ঠোঁটে।

ডাক্তার শোলাপুরকার বুঝি কিছু বলবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলেন। কিন্তু তার দরকার হল না। নিলীমার সঙ্গে নির্মাল্য এসে ঘরে ঢুকল।

আপ্যায়নে উৎকণ্ঠিত হলেন মাসিমা। উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়েও গেলেন। নির্মাল্য লজ্জিত হল, বলল: সত্যি, বড্ড দেরী হয়ে গেল আমার!

না না, দেরী কিসের!

মাসিমা অপ্রতিভ হলেন। বললেন:

আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছি ডাকবার জন্যই, দেরীর জন্য নয়।

আরও একটু পরিষ্কার করেই বললেন নিজের বক্তব্যটা: ভাবলুম, নতুন বাড়ি, পথ চিনে আসতে হয়তো কষ্টই হবে।

ডাক্তার শোলাপুরকার অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলেন নির্মাল্যের বেশভূষা। বুটের পালিশ থেকে 'বো' এর গিঁট পর্যন্ত। নিখুঁত সাহেব। শেষে হেসে বললেন: বিশুবাবু মিথ্যে বলেন না। নির্মাল্যকে নায়কের ভূমিকায় মানায় বেশ।

শুধু মন্তব্যের জন্যে নয়, ডাক্তারের বাঙলা উচ্চারণ শুনেও সকলে হাসলেন। নির্মাল্যও হাসল খানিকটা।

মাসিমার চোখ পড়ল নিতার দিকে। তার সজ্জায় আজ একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। একখানা সাদা সূতোর শাড়ি কোন রকমে জড়িয়ে এসেছে। তনু আপত্তি করেছিল, সে শোনেনি। নিজেদের প্রলেপ ও বর্ণাঢ্যের সঙ্গে তার তুলনা করে বললেন: নিতার হয়েছে কী আজ? এমন বুড়ির মত সাজ!

উত্তর দিতে নিতা দেরী করল না, বলল : সহজ হবার শিক্ষাই তো রোজ পাচ্ছি মাসিমা, বিলাসী হবার সুযোগ আমাদের কোথায় ?

নিতা তার শান্তিনিকেতনের শিক্ষার উল্লেখ করল। সমর্থন পেল তনুর কাছে। তনু বলল : সেখানে একটা আরাম আছে। মানুষের মনের ওপর তারা জোর খাটায় না, তাদের আদর্শ মতো মনটাই আপনা আপনি গড়ে ওঠে।

তনুর মুখের দিকে চাইলেন মাসিমা। তাতে উৎসাহ পেয়ে বলল : শান্তিনিকেতনে যাবার আগে আমি কলকাতার একটা হস্টেলে ছিলাম ! সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে হত। সে জীবন আমি ভুলব না। কয়েকটা দিনেই প্রাণ একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিল।

চোখ কপালে তুলে নিলীমা তার বিস্ময় জানাল।

তনু বলল : সকাল সাড়ে পাঁচটায় ঘণ্টা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিত, তা কী শীত কী গ্রীষ্ম। রাত সাড়ে দশটায় দিত আলো নিবিয়ে। এর মধ্যে স্নানের সময়, খাওয়ার সময় খেলার সময় পড়ার সময়। এমন কি বিছানা তোলা চুল বাঁধা কাপড় পাট করা পর্যন্ত ঘড়ি ধরে করতে হত ! মশারি রোজ খুলে পাট করে রাখতে হবে, রোজ টাঙাতে হবে। রাতে কাপড় বদলে শুতেও হবে। টাকাকড়ি নিজের কাছে রাখতে পাবে না, লোকাল গার্জিয়ান ছাড়া অন্য আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে পাবে না, সেও কেবল শনিবারে। আরও মজার কথা এই যে রাস্তার দিকের জানালায় পর্যন্ত দাঁড়ানো নিষেধ ! পর্দা সরিয়েচ কি জরিমানা। আমার সবচেয়ে কষ্ট হয়েছিল সেদিন, যেদিন কালী

থেকে আমায় দেখতে এসে বুড়ো বাবা-মা ট্যাক্সিতে বসে রইলেন। তাঁদেরও ভেতরে আসবার অধিকার নেই, আর আমি যে জানালায় দাঁড়িয়ে তাঁদের একবার দেখব, তারও উপায় নেই। শেষটায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দয়া হল, তিনি দেখা করার বিশেষ অনুমতি দিলেন।

একটু দম নিয়ে বলল : এ ছাড়াও আছে এমন সব আইন, যা বলা চলে না। সেখান থেকে শান্তিনিকেতন পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলাম।

ডাক্তার হাসতে লাগলেন তন্নুর গল্প শুনে।

তন্নু বলল : হাসচ তুমি, কিন্তু না করেও তাদের উপায় ছিল না। সেই মামলাটার পর থেকেই এমন কড়াকড়ি হয়েছে।

আমি এতো সব জানিনে। বললুম : জেলেও যে এর চেয়ে স্বাধীন ছিলুম আমরা।

মাসিমা চমকে উঠলেন, বললেন : আপনি—

বললুম : হ্যাঁ, পুরনো পাপী আমি। কিন্তু যে পাপে জেল খাটলে আজ মন্ত্রী হতে পারতুম, সে পাপে ভক্তি ছিল না। দাঙ্গায় যোগ দেবার জন্যে দিন কয়েক আটকে পড়েছিলুম মাত্র।

হেসে বললুম : আমাদের এত সব বিধি নিষেধ মানতে হত না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতুম। স্নান করতুম একটা বাঁধানো নালার ভেতর! দশটার সময় সে নালাটা জলে ভরে দেয়া হত। আমরা তখন দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে নেয়ে নিতুম। তারপর খাওয়া। একটা লম্বা শেডের নীচে ঘেঁষাঘেষি হয়ে বসে পংক্তি ভোজন। মন্দ লাগত না।

বলে মাসিমার মুখের দিকে তাকালুম। বড় করুণ দেখাচ্ছিল তাঁকে। গৌরবের সুর মিশিয়ে বললুম : আমাদের খাটতে হত না একেবারে। যারা বেশি অপরাধ করে এসেছে, তারাই উদয়াস্ত খাটত। কেউ তাঁত বুনছে, কেউ ঘানি টানছে, কেউ করছে বেত আর বাঁশের কাজ। সব্জি বাগানে কোদাল চালাচ্ছেও জন কয়েক। আমাদের জন্যে ছিল একটা লাইব্রেরি। সেখানে কেউ বই পড়তুম, কেউ তাস বা দাবা পিটতুম। তারপর যেদিন মামলার দিন পড়ত, সেদিন লাল পাগড়ি ঘেরাও হয়ে যেতুম আদালতে।

তনুর কষ্ট হচ্ছিল, বলল : কষ্ট হত না তোমার ?

কষ্ট কিসের : আমি উত্তর দিলুম : খাবার যা দিত, বাঙলা দেশের কটা লোক তেমন খেতে পায় ? মেসের খাওয়া তো জান, তার চেয়ে ঢের ভালো।

নিতা বলল : খাওয়াটাই আপনার বুঝি পরমার্থ ?

বললুম : তা কেন হবে ! সঙ্গীরও অভাব ছিল না আমাদের। তোমাদের শান্তিনিকেতনে যত মেয়ে, তার চেয়ে ঢের বেশি কয়েদী আমরা একত্র থাকতুম। কী সুন্দর ভেতরের পরিবেশটি ! ছোট একটা পুকুরের চারিদিক ঘিরে ফুলের বাগান। কত রকমের মরসুমী ফুল ফুটে আছে সারাক্ষণ ! বিকেলবেলা ঝির ঝির করে যখন বাতাস বইত, আমরা বাগানে নেমে পড়তুম। কেউ গল্প করতুম, কেউ নরম ঘাসে এলিয়ে পড়ে বই পড়তুম।

নিতার দিকে চেয়ে বললুম : সেবারে কোন একটা বড় কলেজ হস্টেল থেকে খাই খরচের পয়সা বাঁচিয়ে একশো টাকার বই কিনে দিয়েছিল রাজবন্দীদের জন্যে। অনেক বই পড়লুম।

নির্মীলা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সমস্ত শুনে বলল: তবে সবাই জেলে যায় না কেন?

যুক্তি সঙ্গত প্রশ্ন, কিন্তু জবাব আমার তৈরী ছিল। বললুম: আমাদের মর্যাদায় বাধে। তার ওপর জেলে গিয়ে ভাবি, আমরা পরাধীন হয়ে গেলুম, স্বাধীন সত্তা বলে আর আমাদের কিছুই রইল না। দোতলায় খোলা জানালার ধারে বসে মনে হয়, চারদিকের দেয়ালগুলো যেন আমাদের গিলতে চাইচে। যে সমস্ত কুলি খানিকটা দূরে রাস্তার রোদে বসে ইঁট ভাঙছে, মনে হয় তারাও আমাদের চেয়ে কত সুখী। খোলা ময়দানে বই পড়তে পড়তে হঠাৎ চমকে উঠে ভাবি, আমাদের মাথার ওপর বুঝি মুক্ত আকাশ নেই। পশ্চিমের দিগন্তে যে রঙের ছড়াছড়ি, সে বুঝি আমাদের নয়। আমাদের আকাশে কারা কাদা গুলে দিয়েছে।

তনু বলল: একি তোমার নিজের কথা বলচ বিশুদা?

তার প্রশ্ন শুনে আমি হেসে ফেললুম, বললুম: তোমার কি মনে হয় এত সব ভাবতে পারি আমি! খেয়ে পরে দিব্বি স্বচ্ছন্দে আছি যেখানে, এসব বাজে কথা ভেবে মন খারাপ করার দুর্বলতা আমার সত্যিই আসে না। তোমাদের সংস্কার আছে। আমার কথা শুনে তোমরা নিশ্চয়ই চটবে। দেখা করতে এসে আমার বন্ধুরাও এমনি চটত, বলত, আমার জন্যে ভেবে তারা মরে যাচ্ছে, আর আমি নাকি নির্ভাবনায় ফুলে উঠচি। তাদের আমি সান্ত্বনা দিতুম, বলতুম, এ বড় শান্তির জীবন। মাঝে মাঝে টানাটানি করে আদালতে ধরে নিয়ে না গেলে আমি এখান থেকে বেরতে চাই না।

আমার গল্প শুনে ডাক্তার শোলাপুরকার হাসতে লাগলেন।

মেয়েরা কোনো কথা কইলেন না। তাঁদের শিক্ষিত মনে বোধ হয় আঘাত লেগেছে অমর্যাদায়। হেসে বললুম: আরও একবার সুযোগ এসেছিল জেলে যাবার, নির্মাল্যবাবু সেবারে বঞ্চিত করলেন।

আমি একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালুম, নিতাও একটা কটাক্ষে তাকে দেখে নিল। নির্মাল্য কোনো কথা কইল না।

চা খেতে খেতে মাসিমা এক সময় প্রশ্ন করে বসলেন, আমি কী করি! প্রশ্নটা কঠিনই বটে। বললুম বিপদে ফেললেন এইবারে। বেকার বললে ভাববেন, ব্যাঙ্কে আছে জমার মোটা অঙ্ক, ঘরে বসে সুদ ভেঙে খাচ্ছি। খুব ভুল করবেন তাহলে। যদি কাজ করচি ভাবেন, তাহলেও ভুল করবেন। কেননা যা করি, তাকে আর যাই বলুন কাজ বলবেন না।

ডাক্তার হাসছিলেন।

বললুম: ভাববেন না কাজ করতে আমার আপত্তি। বরং এর উল্টোটা সত্যি। লোকে চায় না যে আমি কাজ করি। অর্থোপার্জনের যতগুলি পরিচিত পথ ছিল সবেতেই এক আধবার উঁকি দিয়ে দেখেচি। স্বাধীন ব্যবসা হল না মূলধনের অভাবে। মাষ্টারী করতে পারতুম, কিন্তু কর্মখালি নেই। আইনজীবী হতে হলে চাতকের মতো প্রথম মক্কেলের প্রতীক্ষা যতদিন করতে হয়, সে ধৈর্য নেই। আর তার জন্যে যোগাভ্যাসেরও প্রয়োজন আছে। কেবল মাত্র হঠযোগীরাই নাকি বায়ু ভক্ষণ করে দেহধারণ করতে পারেন।

আরও কিছু বলবার ছিল। কিন্তু সকলের কলহাস্যে সবকিছু ঢাকা পড়ে গেল।

খানিকটা শান্ত হয়ে নিমীলা বলল: আপনি তো সাহিত্যিক আপনার আবার অন্য কাজের ভাবনা কী?

মন্তব্যের ভেতর খানিকটা বোধ হয় শ্লেষ ছিল। বললুম: সত্যি কথা, বাঙালীরা সবাই যদি বাঙলা পড়েন, পয়সার অভাব তাহলে হওয়া উচিত নয়।

বসে বসে হাসা ডাক্তারের অভ্যেস, তিনি হাসতে লাগলেন। মাসিমা বোধ হয় নতুন প্রসঙ্গের কথা ভাবছিলেন। কিছু বলবার আগে বেয়ারা এল ঘরে। নিমালার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

আবার চিঠি।

ঠিকানা দেখেই নিমীলা গর্জে উঠল।

মাসিমা ব্যস্ত হলেন, বললেন: কে, দেবদ্যুতি লিখেছে?

ছেলেবেলায় দেবদ্যুতি নামের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বললুম: পুরো নামটা বলুন তো?

দাঁতে দাঁত চেপে নিমীলা বলল: দেবদ্যুতি ব্যানার্জি, যে 'রোগটা'র কথা সেদিন মা আপনাকে বলছিলেন।

বললুম: তার ঠিকানাটা বলবেন কি?

নিমীলা বলল: এই দেখুন না, এখানকারই একটা হোটেলের ঠিকানা।

বলে চিঠিখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। হাত বাড়িয়ে আমি সেখানা গ্রহণ করলুম।

তম্বুরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল।

তুমি একে চেনো বুঝি বিশুদা?

আমাকে সে জিজ্ঞেস করল।

বললুম ঃ ছেলেবেলায় আমিও এক দেবদ্যুতির সঙ্গে লেখাপড়া শিখেছি। দীর্ঘদিন তার সঙ্গে আর দেখা নেই।

খামের ওপরেই তার ঠিকানা লেখা ছিল। সেটুকু পড়ে নিয়েই উঠে দাঁড়ালুম। বললুম ঃ ওরও মা ছিল না, বাবাও বোধ হয় আজ বেঁচে নেই।

উত্তেজনায় নিতা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে ফিরে বললুম ঃ আজ রাতেই আবার দেখা হবে।

টেবিলে খাবার তখনও অনেক পড়ে ছিল। মাসিমার গলা শুনলুম দরজার বাইরে থেকে ঃ এগুলো শেষ করে গেলে হত না!

কলুটোলার মোড়ে বাস থেকে নামতেই রঞ্জনলালের সঙ্গে দেখা। সে বোধহয় তার মেসেই ফিরছিল। আমায় দেখে একেবারে আঁৎকে উঠল।

বললুম: কি হে, চিনতে পারচ না?

ভাল করে ঠাহর করে রঞ্জন বলল: বিশ্বপতি না? তোমার আলখাল্লা কোথায়?

আশ্চর্য হলুম তার কথা শুনে, বললুম: আলখাল্লা আমি কখনো পরতুম নাকি?

ভাল করেছ হে, খুব ভাল করেছ! সন্নিসীগিরি বড় ঝঞ্ঝাটের কাজ!

একটা বড় রকমের স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল রঞ্জনলালের নাক দিয়ে।

এ নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছে ছিল না, বললুম: আজ একট তাড়া আছে ভাই, কাল আবার দেখা হবে।

রঞ্জন বলল: না না, তোমাকে বিশ্বাস নেই, আজই একবার আমার সঙ্গে চল।

বললুম: কথা দিচ্ছি, কাল সন্ধ্যেবেলা তোমার মেসে যাব।

রঞ্জন বলল: ভদ্রলোকের এক কথা কিন্তু।

হেসে বললুম: এখনো ভদ্রলোক ভাবো।

রঞ্জনও হাসল একটুখানি।

তার কাছে বিদায় নিয়ে দেবদ্যুতির হোটেলে এলুম হেঁটে। ম্যানেজারের কাছে পেলুম তার ঘরের নম্বর।

অন্ধকার তখনও গভীর হয়নি, কিন্তু দরজার গোড়াতেই একজন বৃদ্ধ চাকর বসে বসে ঢুলছিল। চিনতে না পারলেও অনুমান করে বললুম: তোমার বাবু কোথায় মধু?

আমার মুখের দিকে চেয়ে মধু তার মোটা স্মৃতির বইএর পাতা ওলটাতে লাগল একটা একটা করে।

বললুম: বাসুদেবপুরের কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

সেও একটা জায়গায় এসে থেমেছিল, আর বলবার দরকার হল না। দু হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বলল: বুড়ো মানুষ, রাতে আর আগের মতো দেখতে পাইনে।

তার চোখের দৃষ্টি দেখে এ কথা বিশ্বাস হল না, বারান্দার স্বল্প আলোতেও জ্বল্ জ্বল্ করছে তার চোখ জোড়া। দরজা খুলে আমায় ভেতরে এগিয়ে দিল।

দেবদ্যুতিকে চিনতে আমার সময় লাগল না। কিন্তু সে সহজে ধরা দিতে চাইল না। বললুম: চিনতে পাচ্ছিসনে আমাকে? আমি তোদের বিশ্বপতি রে, বাসুদেবপুরের বিশ্বপতি। মনে নেই, আমরা যখন বদলি হয়ে তোদের পাশের বাড়িটায় এলুম, তুই তোদের বাগানের পূর্বদিকবার সেই শাদা পুতুলটার ওপর চড়ে আমাদের দামা দেখছিলি।

একটু থেমে বললুম: কিন্তু এবারে তোর খোঁজ পেলুম কী করে বলত?

তবু কথা কইল না অভিমানী দেবদ্যুতি। আমি তার অভিমানের কারণ জানি। নিতান্ত আপনার বলে যাদের সে চিরদিন জেনে এসেছে, তারাই তাকে দূরে ঠেলেছে সকলের আগে। পুরনো পরিচয়ের বুঝি আর সে নতুন করে মূল্য দেবে না। হার মানতে আমি রাজী ছিলুম না! বললুম: একটু কাজে এসে ছিলুম এখানে। নামের বোর্ডে দেখলুম, কে এক দেবদ্যুতি ব্যানার্জি এসে উঠেছে সাতাত্তর নম্বর ঘরে। সোজা চলে এলুম!

দেবদ্যুতি মুখ ফেরাল, বলল: তোর বাড়ির খবর কী?

বললুম: বাড়ি কোথায় যে বাড়ির খবর?

তোর বাবা?

দেবদ্যুতি প্রশ্ন জানাল।

বললুম: তাঁকেও মুক্তি দিয়েছি।

দেবদ্যুতি দুঃখ প্রকাশ করল না, বলল: বিয়ে করেছিস?

বললুম:

ভেবেছিলুম করব, কিন্তু সে মত পালটে ফেলেছি। প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে আর সে মেয়ের মুখ দেখব না।

কেন?

বিস্মিত দেবদ্যুতি তার প্রশ্ন জানাতে দেরি করল না।

বললুম: মেয়েটি আমায় ভালবাসে বলেই জানতুম। তার বাবা মাও যে আমায় স্নেহ করেন, তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সে ভুল হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। একদিন মনে হল, সবাই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানলুম, আমি একটা মারাত্মক

রোগে ভুগছি বলে তাঁরা সন্দেহ করছেন। মেয়েটিকে চিঠি লিখেও কোন উত্তর পেলুম না।

নেকড়ের মতো চোখ মেলে দেবদ্যুতি আমার কথাগুলো যেন গিলছিল। বললুম: সত্যি বলছি ভাই, দিনকয়েক পরেই সমস্ত স্পষ্ট হয়ে গেল। ডাকে না ফেলে মেসের চাকরের হাতে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলুম। লোকটা ফিরে এসে কী বলল জানিস? বলল হাতের লেখা দেখেই চিঠি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে। মেয়েটির হাতেই দিয়েছিল চিঠিখানা।

দেবদ্যুতি কথা কইল না। আমি একটা ঢোক গিলে বললুম প্রেম এমন ঠুনকো জানলে এতদূর এগোতুম না কিছুতেই।

দেবদ্যুতি এবারে গর্জে উঠল, বলল: এসব সত্যি কথা বলছিস তুই?

আমি উত্তর না দিয়ে তাকে ভাববার অবসর দিলুম।

লুকোস না আমার কাছে।

দেবদ্যুতি অনুরোধ জানাল।

এবারে আমি উত্তর দিলুম: বিয়ে করার বাসনা ত্যাগ করে ভালো করিনি কি আমি?

দেবদ্যুতি আমার কথার জবাব দিল না, বড় অন্যমনস্ক দেখাল তাকে। বললুম: তুই হলেও কি ঠিক এমনি সঙ্কল্প করতিস না?

সে কথা তো ভেবে দেখিনি ভাই!

আত্মস্থভাবে সে আমার উত্তর দিল।

দৃঢ়স্বরে বললুম: না না, ভেবে তোকে দেখতেই হবে। কাল আমি একবার উত্তর নিতে আসব।

অসহায়ভাবে দেবদ্যুতি বলল : আচ্ছা।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটল।

এক সময় বললুম : কী করিস আজ কাল, তাতো বললি না।

চূণের কারবার।

দুটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করে দেবদ্যুতি থেমে রইল অনেকক্ষণ, তারপর বলল : কিন্তু কলকাতায় কেন এসেছি, জানিস? বললে তুইও ভয় পাবি, তুইও আর আমার কাছে ঘেঁষবি না। হোটেলে ওঠবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। এখানে আছেন এমন অনেক লোক যাঁদের প্রাণের দাম আছে। যাঁরা না থাকলে চোখের জল ফেলবার জন্যে পড়ে থাকবে আরও অনেকে। সেই সব ভাগ্যবানদের জীবনে মৃত্যুর বিষ ছড়াব, ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল!

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বলল : তারপর ভাবলুম, জগতে যখন এত অশান্তি, এত হানাহানি এত ছেঁড়াহিঁড়ি, আমিই বা কেন পরের জন্যে ভাবতে যাব, যাঁরা আমার কেউ নয়, কোনদিন আপন হবে না।

এবারে আমি চুপ করে রইলুম। দেবদ্যুতি নিজেই বলতে লাগল : এই দেখ, আমার চোখের নীচে কত কালি জমেছে, কেমন ফ্যাকাশে হয়েছে গায়ের রঙ আর কপালে পড়েছে কত অসংখ্য খাঁজ! কিন্তু একটা মাস আগেও কি আমার এমনি চেহারা ছিল! এমনি শাদা রঙের চুল, এমন হিংস্র দৃষ্টি আর খিটখিটে মেজাজ?

দেবদ্যুতি হাঁপাতে লাগল, কিন্তু থামল না। বলল : এক মাসে ওজন কত কমেছে জানিস? তেইশ পাউণ্ড। বুকের মাপ কমেছে

তিন ইঞ্চি। কদিন আগেও যে পেন্টুলুনের পেটের বোতাম আঁটতনা, এখন তা ব্রেসেস দিয়ে টেনে রাখতে হচ্ছে।

এক নিঃশ্বাসে বলল: আমি এখন থাইসিসের রোগী।

হঠাৎ এক ঝলক কাশি এসে তাকে বিব্রত করে তুলল। খানিকটা সুস্থ হতেই মুখখানা পরিষ্কার করে নিল টেবিলের রুমালে। চোখের কোণে দু ফোঁটা জল বিদ্যুতের আলোয় চক চক করে উঠল।

এ সংবাদ আমি পেয়েই এসেছি। তাই সহজভাবে বলতে পারলুম: ঘটনাটা সব খুলে বল দেখি!

দেবদ্যুতি যেন হঠাৎ চটে উঠল, বলল: তুই ভয় পেলি না যে!

রাগের ভান করে বললুম: থাইসিস কি বাঘ না ভালুক যে নাম শুনলেই ভয় পাব!

কেমন বিহ্বল ভাবে তাকাল দেবদ্যুতি।

বললুম: এবারে বল দেখি তোর গল্পটা। লুকোসনি কিছু।

দেবদ্যুতি আর আর আপত্তি করল না, বলল: ও মাসের তের তারিখ আম্বালায় মিষ্টার মুখার্জির বাড়িতে প্রথম রক্ত ওঠে।

অনেকখানি?

আমি প্রশ্ন করলুম।

বেশি না, কয়েক ফোঁটা মাত্র। কিন্তু সেদিন থেকে টেম্পারেচার নিতে শুরু করলুম। বিকেলের দিকে রোজই খানিকটা জ্বর হত, কোনদিন সকালেই আসত জ্বরটা। কোনদিন কাশির সঙ্গে অনেকখানি রক্ত পড়ল মুখ দিয়ে। সেদিন আর কারও সন্দেহ রইল না, সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয়ে গেলুম। যারা নিয়মিত আমার বাড়ি আসত

ভাল চায়ের লোভে, তারাও আসা ছাড়ল। কখনো পথে দেখা হয়ে গেলে মুখ ফিরিয়ে সরে যেতে লাগল।

একটু থেমে বলল : মধুটাকে বাড়ি যেতে বলেছিলুম, হতভাগা কিছুতেই গেল না। রোজ বকতুম। মেরেছিলুম একদিন। কিন্তু ওর গোঁ গেল না। মুখে তর্ক করা ওর চিরদিনের স্বভাব। আজকাল কথাও কয় না, কথাও শোনে না।

বললুম : এই তোর সম্পূর্ণ ইতিহাস ?

আবার চটে উঠল দেবদ্যুতি, বলল এক মাসে মহাভারত গড়তে বলিস !

বললুম : আমি ডাক্তার নই। কিন্তু মনে হচ্ছে রোগের চিকিৎসার চেয়ে তোর মনের চিকিৎসারই দরকার বেশি।

মধু কোথায় লুকিয়েছিল, বলল : সেই কথাটাই ওকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও দাদাবাবু।

ভ্রূ কুঁচকে দেবদ্যুতি খেঁকিয়ে উঠল, বলল : রক্তটাও কি মনের নাকি হতভাগা ?

মধুর জবাব আর শোনা গেল না, আমিও উত্তর দিলুম না তার কথার। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম। আমার পয়সা থাকলে তোকে পাহাড়ে নিয়ে যেতুম।

তোর নেই বলে কি জগতের কারও পয়সা নেই !

দেবদ্যুতি উঠে দাঁড়াল। অ্যাটাচি কেস থেকে ব্যাঙ্কের একখানা চেক বই বার করে আমার কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। বলল : এই নে !

বললুম : তোর টাকা আমি কেন নিতে যাব ?

হতাশ ভাবে দেবত্যুতি বসে পড়ল পাশের চৌকির ওপর। তার বিষন্ন দৃষ্টি দেখে আঘাত পেলুম। বললুম: কখনো আমার অবাধ্য হবিনে, এই প্রতিশ্রুতি দিলেই তোকে ভাল করার দায়িত্ব আজ নেব।

ছেলেমানুষের মত দেবত্যুতি সম্মতি জানাল।

চেক বইটা ফিরিয়ে দিয়ে বললুম: এটা তোর কাছেই রাখ, যখন দরকার হবে চেয়ে নেব।

( ১৫ )

ডাক্তার রায়চৌধুরীর কাছে দেবদ্যুতির বুকের কয়েকখানা ছবি তোলার ব্যবস্থা করে তনুর বাড়ি যখন ফিরলুম, রাত এগারটা তখন বেজে গেছে। মধ্য কলকাতার বিপুল কোলাহল এখনও কমেনি। কিন্তু দক্ষিণের এ অঞ্চলে অন্ধকার রাত জমাট বেঁধেছে অনেকক্ষণ। বাইরের বসবার ঘরে আলো জ্বলছিল। আমাকে ফটক পার হতে দেখেই দোতলার বারান্দায় কলরব উঠল।

নিতার গলা শুনতে পেলুম, বলল: ঐ যে, বাবু আসচেন।

সিঁড়ির নীচে একজন বেয়ারা অপেক্ষা করছিল, উঠে আলো জ্বালিয়ে দিল। সোজা ওপরে উঠে এলুম।

অন্তরঙ্গভাবে ডাক্তার শোলাপুরকার অভ্যর্থনা জানালেন, বললেন: আমি তো আপনার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলুম। শুধু নিতার জন্যেই জেগে বসে আছি। সে বললে, ভদ্রলোক ফিরবেন যখন বলে গেছেন, তখন বাইরে কিছুতেই রাত কাটাবেন না।

এগিয়ে এসে নিতা যোগ করল: একগুঁয়ে তো কম নন!

এসব কথায় উৎসাহ ছিল না তনুর। সে বলল: ভদ্রলোক তোমার ছেলেবেলার বন্ধু নিশ্চয়ই।

নিতার কথা শুনে হাসছিলুম, এবারে তনুর প্রশ্নের উত্তরে শুধু ঘাড় নাড়লুম।

ব্যস্তভাবে তনু বলল : এখন শেষ অবস্থা, তাই না ?

এসব অদ্ভুত চিন্তার উপাদান যে তারা মাসিমার কাছ থেকেই আহরণ করে এনেছে, তা সহজেই বুঝতে পারলুম। তাঁদের নিজেদের কাজের সমর্থন পাবার জন্যই এইসব অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিতে হয়েছে। বললুম : রোগী ঘেঁটে এলুল, জামা কাপড়টা আগে বদলে আসি।

অনেক রোগ ঘেঁটেছি ছেলেবেলায়। রাত জেগেছি পড়শীর বাড়িতে। কিন্তু সাবধান হবার প্রয়োজন বোধ করিনি! আজ এদের জন্যই সে প্রয়োজনের কথা মনে এল।

ডাক্তার হাসলেন, বললেন : রোগী ঘাঁটলেই যদি রোগ হত, তাহলে জগতের ডাক্তার আর নার্সমণ্ডলী আজ স্বর্গের নন্দনকাননে সুখে বিচরণ করতেন।

বাঙলায় সুরু করে শেষ করলেন ইংরেজীতে। ভাষার দুর্বলতা ঢাকবার এ তাঁর পুরনো কৌশল।

পাশ কাটিয়ে আমি নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলুম। ডাক্তার হাত ধরে আমায় বেতের চেয়ারটায় বসিয়ে দিলেন। ধমকের সুরে বললেন : বলুন তো, কী দেখে এলেন! চিকিৎসক হিসেবে আমি হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারব।

আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে নিবেদন করলুম। মনোযোগ দিয়ে সবটা শুনে বললেন : এরকম সামান্য জ্বর ও গলা দিয়ে দুএকবার রক্ত ওঠা টি. বি. ছাড়াও অন্য নানা কারণে ঘটতে পারে। এক্স-রে করে না দেখে কিছুই জোর দিয়ে বলা যায় না।

বললুম : কাল সকালেই ছবি নেবার ব্যবস্থা করে এসেছি।

তন্নু বাধা দিল, বলল : হাত পা ধুয়ে দুটো খেয়ে নাও বিশুদা। পরে আবার গল্প হবে।

তোমরাও কি না খেয়ে আছ নাকি ?

আমি চমকে উঠলুম।

ডাক্তার বললেন : প্রায় সেইরকম। আমরা এইমাত্র শেষ করেছি।

টেবিলে আমাকে ঘিরে বসলেন সবাই, কথা কইলেন ডাক্তার। বললেন : কিছুদিন আগে দেওঘরে আমি একটি রোগী পেয়েছিলুম। বম্পাস টাউনে বাড়িভাড়া নিয়ে মৃত্যুর দিন গুণছিলেন। ভদ্রলোকের অল্প অল্প জ্বর হত আর মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছিল বার কয়েক। তল্প স্বল্প নয়। এক একবারে এক এক পেয়ালা তাজা রক্ত পড়েছে। আমার কেমন সন্দেহ হত যে রক্ত লাঙসের নয়। বুকের ছবি নিয়ে দেখলুম, আঙুরের থোকার মতো দেখাচ্ছে তাঁর লাঙস। মনে হল, ও ছাপ ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের। ভদ্রলোকও তা স্বীকার করলেন। মাদ্রাজের ভেল্যুরে তাঁকে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলুম। আমার সন্দেহ তাঁরা সমর্থন করলেন।

ডাক্তারীর জ্ঞান আমার নেই, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি আছে। বললুম : দেবদ্যুতি সিগরেট খায় চিমনীর মতো, আর কাজ করে চূণের কারখানায়! কেশে কেশে গলা চিরেও তো রক্ত পড়তে পারে।

খুব পারে।

ডাক্তার আমাকে উৎসাহ দিলেন।

তন্নু হঠাৎ অন্য প্রশ্ন করল, বলল : একটা কথা তোমার কাছে

জেনে নেয়া হয়নি। পরশু সকালবেলা মাসিমার সঙ্গে তোমার কী আলোচনা হয়েছে, তা আমাদের বলোনি।

হেসে বললুম : এত রাত্রে এ প্রশ্নটা এমন মূল্যবান কেন মনে হচ্ছে তন্সু !

তন্সু বলল : হচ্ছে বলেই তো জানতে চাইচি !

তেমনি হেসে বললুম : তোমরাও একটা কিছু অনুমান করেচ নিশ্চয়ই।

অভিনয়ের ভঙ্গীতে ডাক্তার বলে উঠলেন : আর অনুমান নয় বিশুবাবু, তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অনুমানের বাণে সেই থেকে আমি জর্জরিত হয়ে যাচ্ছি। যা বলবার, দয়া করে চট করে বলে ফেলে আপনি আমায় রক্ষা করুন।

আমি হেসে ফেললুম, বললুম : ব্যাপার কী বলুন তো !

ডাক্তার বললেন : আপনি তো বন্ধুর খোঁজে নিরুদ্দেশ হলেন। এদিকে নির্মাল্যের আচরণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এতক্ষণ তার কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছিল আমাকে। এই দুদিনের ভেতর এমন কী ঘটে থাকতে পারে, আপনার কী আলোচনা হয়েছে মাসিমার সঙ্গে, এইসব কঠিন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পেরে আমি ত্রিশঙ্কু হয়ে আছি।

এবারে তাঁর ছদ্ম গাম্ভীর্য ত্যাগ করে হেসে ফেললেন, বললেন : বললুম, 'বিশুবাবু ফিরুন, তাঁর মুখেই সব শুনতে পাবে।' কিন্তু কে মানে আমার কথা ! তন্সু বললে, 'বিশুদা যখন মাসিমার বাড়ি থেকে ফিরলেন, কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তাঁকে। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েচে ? উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন।' সায় দিয়ে

নিতা বলল, 'ওকে তো অন্যমনস্ক দেখা যায় না কখনো!' সত্যিই যে বড় ভাবনার কথা, আমাকে তা স্বীকার করতেই হল।

বলে আবার গম্ভীর হলেন।

ভাবিয়ে মারার অভ্যেসটা তোমার আজও গেল না বিশুদা।

তিরস্কারের সুর শুনলুম তনুর কণ্ঠস্বরে।

হেসে বললুম: অভ্যাস হল চীনে জোঁক। একবার ধরলে তাকে ছাড়ানো দায়।

ডাক্তার বিস্ময় প্রকাশ করলেন, বললেন: আপনি এখনও দেরি করছেন বিশুবাবু!

বললুম: আলোচনার সবটুকু তো মনে নেই, তবে যে উদ্দেশ্যে ডেকে নিয়ে গেছেন তা বলতে পারি।

সবাই উদগ্রীব হলেন।

বললুম: তোমাদের মাসিমা তার মেয়ের বিয়ে স্থির করলেন যে হতভাগার সঙ্গে, তার মারাত্মক ব্যাধি। কাজেই একটি নতুন পাত্র চাই, আর আমাকেই তা খুঁজে দিতে হবে।

তুমি কী উত্তর দিলে?

ব্যস্তভাবে তনু প্রশ্ন করল।

আমি সত্যি কথাই জানিয়ে দিলুম। বললুম: হাতের কাছে এক আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় পাত্র তো দেখছিনে।

ডাক্তার প্রবলভাবে হেসে উঠলেন, বললেন: ওদের ফেভরিট হতে হলে এ খদ্দরে চলবে না বিশুবাবু, পাৎলুন ধরতে হবে।

নিতা বলল : পা ফাঁক করে পাইপ টানতে পারবেন ?

দরকার হলে শিখতে হবে বৈকি !

গম্ভীরভাবে আমি জবাব দিলুম। তাঁরা হেসে উঠলেন।

আমাদের হাসিতে তনু যোগ দিল না। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সে হয়ত অন্য কিছু দেখতে পেয়েছিল। আমার উত্তরে তার আশঙ্কাই শুধু কণ্টকিত হল।

## ( ১৬ )

পরদিন সকাল বেলাতেই গেলুম দেবদ্যুতির কাছে। ডাক্তার শোলাপুরকারের কী একটা জরুরী কাজ ছিল। ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে আসতে পারলেন না।

দেবদ্যুতি যে আমার অপেক্ষা করছিল, তা বুঝতে পারলুম তার প্রথম কথাতেই। বলল ঃ তুই ঠিকই বলেছিস।

কী বলেচি আমি ?

আমি কঠিন ভাবে প্রশ্ন করলুম।

দেবদ্যুতি তার নিজের কথায় জের টানল। বলল ঃ অতীতটাকে আমার ভুলে যেতে হবে।

আমার ওষুধে কাজ হয়েছে দেখে সুখী হলুম, তবু বললুম ঃ কেন রে ?

দেবদ্যুতিকে যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বলল ঃ স্ত্রী পুরুষে সত্যিকার বন্ধন হয় প্রেমে, বিবাহে নয়। তাই বিবাহের বিচ্ছেদ আছে, প্রেম অমর।

ভাল লাগল তার এই ভাবনাটুকু। প্রতিবাদ করবার প্রবৃত্তি হল না। বললুম ঃ আমি যে মেয়েটিকে ভালবাসতুম, শুনতে পাই সে নাকি তার নতুন বন্ধুদের কাছে গল্প করে। একটা ইম্পস্টার রোগ ভাঁড়িয়ে প্রেম করতে আসত। কেউ আমার নাম করলে বলে, ও স্কাউনড্রেলটার নাম আর মুখে এনোনা তোমরা। তার কাছে আমার মৃত্যু হয়ে গেছে অনেক আগেই।

দেবহ্যুতি আমার হাত চেপে ধরল, বলল: তুই আমার কথাই বলছিস না তো?

উত্তরটা এড়িয়ে গেলুম, বললুম: এ শুধু তোর আমার কথা নয় দেবু, এ আমাদের সভ্যতাভিমানী নতুন সমাজের কথা। আঁচড়টা কারও একার পিঠে পড়ে না। আমাদের পঙ্গু সমাজটাকেই আঘাত করে।

দেবহ্যুতি কথা কইল না অনেকক্ষণ, নেশাখোরের মত ঝিম ধরে বসে রইল। এক সময় সচেতন হয়ে বলল: কোথায় যেতে হবে বলেছিলি, চল বেরিয়ে পড়ি।

সন্ধ্যে বেলায় দুই বন্ধুতে যখন হোটেলে ফিরলুম, ক্লান্তিতে সারা দেহ তখন ভরে গেছে। নানা চিকিৎসক নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ করে রায় দিয়েছেন যে রোগ যক্ষ্মা নয়, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। অতিরিক্ত ধোঁয়া ধূলোর ভেতর বেশিক্ষণ কাজ করে এই বিপাক হয়েছে। কিছুদিন পাহাড়ের হাওয়া খেলেই ভাঙা স্বাস্থ্য আবার জোড়া লেগে যাবে।

খবর শুনে মধু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল: কাল সকাল বেলা আমার ছুটি চাই।

দেবহ্যুতি তেড়ে উঠল। বলল: ছুটি কী হবে তোর?

মধু চুপ করে রইল। আমি তার স্বরূপ জানতে পেরেছি দেবহ্যুতির কথাতেই। বললুম: কালীঘাটের কাজ তো? বামুনের কাছে লুকোলে পূজোর ফল হয় না।

মাথা চুলকে মধু পালিয়ে গেল।

বললুম: এবারে আমাকে ছুটি দে।

দেবদ্যুতি আবার তেড়ে উঠল, বলল: তোর ছুটিই যদি চাই তো মরতে এখানে এসেছিলি কেন?

বললুম: তা হলে কি চিরকাল তোর কাছেই থাকতে হবে?

দেবদ্যুতি কোনো জবাব দেবার আগেই বাইরে থেকে টোকা দিয়ে হোটেল ম্যানেজার ঘরে এলেন। বললেন: দুপুর থেকে বার বার আপনার ডাক আসছে। টেলিফোন নম্বরটা আমি টুকে রেখেছি।

নম্বরটা আমি চিনলুম, বললুম: এ তমুদের ফোন নম্বর।

দেবদ্যুতির জড়তা কেটে গেছে। সে এখন অন্য মানুষ। ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর টেলিফোন ধরল। নিজেই কানেকসন নিয়ে আলাপ জমিয়ে ফেলল: ডক্টর শোলাপুরকার! নমস্কার! পরিচয় না থাকলেও আমাকে চিনবেন, আমি দেবদ্যুতি ব্যানার্জি, আপনাদের বিশ্বপতির ছেলেবেলার বন্ধু।

দেবদ্যুতি ইংরেজীতে কথা বলছিল, বলল: শুনলুম আপনি অনেকবার আমায় ডেকেছেন। তবু নিজের অনুরোধটা আগে জানিয়ে নিই, পরে আপনার প্রশ্নের জবাব দেব। বিশ্বপতিকে আমি আটকালুম। ভয় নেই, আমার নিঃশ্বাসে যে বিষ নেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। কী বললেন ডাক্তাররা? বললেন, টি, বি, বলে যা সন্দেহ করা হয়েছিল, তা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। চূণের কারবারে অতিরিক্ত লাভের চেষ্টার শাস্তি। আপনি আসবেন এখানে? কাল? সে তো উত্তম কথা। আর আমি বোধ হয় পরশু দার্জিলিঙ

যাচ্ছি। আপনারা এলে বিশ্বপতিকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি চেয়ে নেব।

একটু থেমে বলল: আর একটা অনুরোধ আছে। আপনারা যাকে মাসিমা বলেন, মিসেস মুখার্জি, তাকে আমার কথা কিছু বলবেন না। বিশ্বপতির খোঁজ করছিলেন ওঁরা দু'দিনে বার পাঁচেক। আচ্ছা আমি তাকে বলব। কাল সকাল বেলাই আসচেন তো? আচ্ছা, ধন্যবাদ। ছেড়ে দিই তা হলে? নমস্কার!

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে দেবদ্যুতি বলল: এবারে শান্তি হল তো?

হতভম্বের মতো ম্যানেজার বাবু চেয়েছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে বললুম: ওঁর হয়েছে, আমার নয়।

লজ্জা পেয়ে সে ভদ্রলোক নিজের কাজে মন দিলেন।

দেবদ্যুতি ক্ষেপে উঠল, বলল: আবার কী বাকী রইল?

হেসে বললুম: রঞ্জনলালকে কথা দিয়েছি, আজ সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে দেখা করব।

সে রত্নটি আবার কে?

দেবদ্যুতি প্রশ্ন করল।

বললুম: আমার পুরনো মেসের বন্ধু।
কাল এখানে আসবার সময় পথে আটকে ছিল, কথা না দিয়ে ছাড়া পেলুম না।

দেবদ্যুতি আর আপত্তি করল না, বলল: কতক্ষণে ফিরবি তা হলে?

বললুম: কলেজ রোর মুখেই মেসটা। ঘণ্টা খানেক হয় তো সময় লাগবে।

বলল : একটা ট্যাক্সি ডেকে
আমি তার মুখের দিকে চেয়ে শুধু

রঞ্জনলাল আমার অপেক্ষাই করছিল। মেসের দরজাতে পা দিতেই চেঁচিয়ে উঠল।

কী হল, কী হল?

বলে দক্ষিণের ঘর থেকে ননীগোপাল বাবু এগিয়ে এলেন।

ঘরের ভেতর অজিতবাবু কাপড় ছাড়ছিলেন। কাছাটা হাতে করেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। চিনি না এমন দু চারজনও রঞ্জনের চীৎকারে ছুটে এলেন।

আপনার গেরুয়া কই বিশ্বপতিবাবু?

চোখ কপালে তুলে অজিতবাবু প্রশ্ন করলেন।

অ্যাঁ, বিশ্বপতিবাবু! কোথায় তিনি!

বলতে বলতে আরও অনেকে এলেন।

রাধাগোবিন্দবাবু আমার শূন্য হাতের দিকে চেয়ে বললেন: একি, তোমার চিমটেটা কোথায় ফেলে এলে?

বাণীকণ্ঠ বলল : আর তোমার কমণ্ডলুটা?

ভীড়ের ভেতর থেকে দেবেশবাবু এগিয়ে এসে রঞ্জনলালের হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন। বললেন : আপনাকে কিছুতেই আর ছাড়ব না রঞ্জনবাবু, এবারে আপনার শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় আমার করে দিতেই হবে।

গম্ভীর হয়ে রঞ্জন বলল : তিনি তো প্রতি বছর আসেন না দেবেশবাবু। তপস্বী পুরুষ, বিশ বছর পর একবার কৈলাস থেকে

নামেন। এর আগে এ[illegible] আমার বয়স যখন সতের বছর, আবার আসবেন আর[illegible]র পর।

যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে দেবেশবাবু তখুনি বিদায় নিলেন।

এসব কী রঞ্জন?

আমি বিরক্ত হলুম।

উপস্থিত জনতার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে রঞ্জন বলল: বিশ্বপতি আবার সংসারী হয়েছেন। এসব অবান্তর প্রশ্ন করে তাঁকে আর উদ্‌ব্যস্ত করবেন না, এই আমার অনুরোধ।

আমার হাত ধরে টেনে বলল: ঘরে চল। সব বলছি তোমাকে।

আমি কিছু বলবার অবকাশ পেলুম না। দেখলুম, রঞ্জনের টানে তার ঘরে এসেই পৌঁছে গেছি।

দরজার খিল লাগিয়ে রঞ্জন হাসতে শুরু করল। ফুলে ফুলে গড়িয়ে গড়িয়ে হাসি, সে হাসি যেন আর থামতে চায় না।

বললুম: কী হল তোমার?

খানিকটা সামলে রঞ্জন বলল: দেখলে দেবেশবাবুকে?

ভদ্রলোকের কি মাথা খারাপ হয়েছে?

আমি প্রশ্ন করলুম।

রঞ্জন আরও খানিকটা হেসে নিল, তারপর বলল: আজ সকালবেলা ভদ্রলোক যখন এই ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, চট করে নিজের পা দুখানা মুড়ে পদ্মাসনে ধ্যানস্থ হলুম।

বলে চৌকির ওপর পা মুড়ে বসল। বলল: চোখ বুঁজেই অনুভব করলুম, ভদ্রলোক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গেলেন। একটু পরে দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগলুম, 'বিশ্বপতি, তোমাকে আসতেই হবে, আজ সন্ধ্যাবেলাতেই তোমাকে আমার চাই!' আস্তে আস্তে

ভদ্রলোক সরে গেলেন। আমিও উঠে পড়ে সিঁদুরের প্যাকেট মুড়তে লাগলুম। তারপরের ঘটনা তো তুমি নিজের চোখেই দেখতে পেলে।

এবারে আমিও হাসলুম তার সঙ্গে।

রঞ্জন বলল: গেল বছর তোমার আকস্মিক অন্তর্ধানের পর মেসে রটে গেল, তুমি সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে গেছ। কথাটা লোকের মুখে মুখে এমন আকার ধারণ করেছে যে তোমার নাম করলেই আজকাল আমাদের চোখের সামনে এক দীর্ঘ বলিষ্ঠকায় সন্ন্যাসী মূর্তি ভেসে ওঠে। এ ছাড়া অন্য মূর্তিতে তোমাকে আমরা ভাবতেই পারিনে।

এ কথার কী উত্তর দেব ভেবে পেলুম না। বললুম: কাল কী একটা জরুরী দরকারের কথা বলছিলে?

রঞ্জন ব্যস্ত হয়ে উঠল, বলল: ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ, ভুলেই গিয়েছিলুম আর কি!

বলে টেবিলের ছড়ানো কাগজপত্রের ভেতর থেকে একখানা টাইপ করা শাদা ফুলস্কেপ কাগজ বার করল। নিচের দিকে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল: দস্তখত করতো একটা, তোমার পুরো নাম, বেশ পরিষ্কার করে।

বললুম: কী জিনিষ এটা?

কর না সই: রঞ্জন ঝাঁঝিয়ে উঠল: তোমার মৃত্যুদণ্ড নয় নিশ্চয়ই।

হাতের কাছেই দোয়াত ও কলম ছিল, কোনরকমে একটা দস্তখত করে দিলুম।

রুট করতে করতে রঞ্জন বলল : হ্যাঁ ভাল কথা, চাকরি বাকরি তো কিছু কর না আজকাল ?

সান্ত্বনা দিয়ে বললুম : না ভয় নেই, ও বালাই জোটেনি আজও।

আশ্বস্ত হয়ে রঞ্জন বলল : অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ একটি সম্প্রতি খালি হয়েছে। খবরের কাগজের খবরটুকু পড়েই তো তুমি খালাস, কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়বার অভ্যাস করলে না কোনকালে। এই টুকরোটা কেটে রেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, যদি কখনো দেখা হয়ে যায়—

হেসে বললুম : দরখাস্তটাও কি আগে থাকতে ছেপে রেখেছিলে ?

রঞ্জনও হাসল, বলল : না, অতোটা নির্বোধ নই। তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর আজ সকালে পয়সা খরচ করেচি।

এক পাগলের কথা আমার মনে পড়ল। লোকটা নিজে সিগরেট খায় না, কিন্তু কিনে রাস্তার লোককে বিলিয়ে বেড়ায়। হাতে যখন পয়সা থাকে না, তখন সিগরেট বিলোতে পাচ্ছে না বলে দুঃখ করে।

কয়েকটা পয়সা রঞ্জনকে ফেরত দিয়ে তার আন্তরিকতায় আঘাত দিতে সাহস হল না। বললুম : তোমার সিঁদুর আজকাল কেমন কাটছে ?

রঞ্জন হেসে বলল : পরের মুখে ঝাল খেয়ে আর লাভ কী ? বরং বিয়ে করলে একটা সংবাদ দিও, এক কৌটো উপহার দিয়ে আসব। ঘরে যদি তাগিদ পাও, বুঝবে বাজারেও চলছে বেশ।

বললুম ঃ সেদিনের অপেক্ষা করে থাকলে উত্তরটা বোধ হয় পাওয়াই যাবে না।

দেখাই যাক না।

বেশ সমঝদারের মতো একটা ভারিক্কি হাসি হাসল রঞ্জনলাল।

এক সময় চৌকি ছেড়ে রঞ্জন ষ্টোভে আগুন দিল। বলল ঃ এক পেয়ালা চা খাও।

একটু থেমে বলল ঃ এই ষ্টোভ এই সাজ সরঞ্জাম সবই তোমার। এতেই চালিয়ে যাচ্ছি।

বললুম ঃ আমি তো নামে ওগুলোর মালিক ছিলুম। যথার্থ মালিক তো যে ব্যবহার করে সেই।

পাম্প করতে করতে রঞ্জন বলল ঃ তুমি চলে যাবার পর কিছুদিন আমার মান বেড়েছিল। গাড়ি ঘোড়া হাতি পদাতিক তোমার খোঁজ করতে আসত।......

তাড়াতাড়ি ফিরব ভেবেছিলুম। গল্পে গল্পে রঞ্জনলাল অনেকক্ষণ আটকে রাখল।

শোলাপুরকার পরিবারের সঙ্গে দেবহ্যুতির পরিচয় হল পরদিন সন্ধ্যাবেলাতে। সকালে ডাক্তার আসতে পারেননি। বিকেল বেলায় গাড়িতে তুলে ধরে আনলেন নিজের বাড়িতে। অত্যন্ত পরিচিতের মত তনু তাকে গ্রহণ করল, বলল : আমরা সেই সকাল থেকেই আপনার অপেক্ষা করছি।

দেবহ্যুতি বলল : রোগে রোগে বড় ঝিমিয়ে গেছি।

ডাক্তার বললেন : মিথ্যে আপনি ভয় পেয়েছিলেন। এমন সুন্দর শরীরে কখনও রোগ থাকতে পারে !

আমি বললুম : প্রথম দিনে ওকে দেখলে কিন্তু একথা বলতেন না ডাক্তার। যে চেহারা নিয়ে ও এসেছিল, দেখলে ভয়ই হত।

দেবহ্যুতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম : ঘরে ঢুকে দেখি, আরাম চৌকিতে সোজা হয়ে বসে ও আয়নায় মুখ দেখছে। কখনো টেনে টেনে হাসচে। কখনো বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে বারে বারে।

মিথ্যে কথা।

তীব্র কণ্ঠে দেবহ্যুতি আপত্তি জানাল।

বললুম : সাক্ষী যখন নেই, তখন চেপে যাওয়াই ভাল। তবে এটুকু স্বীকার করবি তো যে এখানে এসেই তুই তোর মনটা আবার ফিরে পেয়েছিস।

ডাক্তার বললেন : শরীরটা ফিরে পাবেন পাহাড়ের হাওয়ায়।

বললুম ঃ আশা তো তাই করছি।

আপনিও কি পাহাড়ে যাচ্ছেন ?

নিতা আমাকে প্রশ্ন করল।

বললুম ঃ না গেলে দেবু যুদ্ধে যাবে বলে ভয় দেখাচ্ছে।

দেবদ্যুতি আপত্তি করল, বলল ঃ আমি ভয় দেখিয়েছি, না তুই যুদ্ধে যাবার মতলবে আছিস ?

ডাক্তার হেসে বললেন ঃ যুদ্ধ কোথায় বিশুবাবু ? কোরিয়ার যুদ্ধও যে থেমে গেল।

বললুম ঃ আমরা বারুদের ওপর বসে আছি বলেই যুদ্ধ আর দেখতে পাইনি। পৃথিবী ধ্বংস না হলে কি যুদ্ধের শেষ হবে ?

মেয়েরা যেন খানিকটা শঙ্কিত হল। সে ভাব লক্ষ্য করে বললুম ঃ যুদ্ধ করাটা কি তোর আমার কাজরে, যে যুদ্ধে যাব বললেই গেলুম।

তনু বলল ঃ তোমার কিছুই অসাধ্য নেই বিশুদা, তুমি সব পার। কাউকে শাস্তি দেবার দরকার হলে তুমি মাও মাও মিন মিনদের হয়েও যুদ্ধ করতে যাবে।

ডাক্তার তার মন্তব্য শুনে হাসতে লাগলেন।

আমি বললুম ঃ পারিনে শুধু যা পারার দরকার ছিল সব চেয়ে বেশি, সেই অর্থের চেষ্টায় মন দিতে।

গম্ভীরভাবে দেবদ্যুতি বলল ঃ ও গুণটা নষ্ট হতে দিস না বিশু, ওটা মহাপুরুষের লক্ষণ।

বললুম ঃ ভগবানটা পেটটা না দিলে মহাপুরুষ হতে আপত্তি ছিল না। ওর দাবী যে সকলের ওপরে।

নিতা বলল ঃ ভগবান আবার ভুল করে মনের বদলে আপনাকে আর একটা পেট বেশি দিয়ে ফেলেছেন।

সবাই হেসে উঠলেন, খোঁচাটুকু নিঃশব্দে আত্মসাৎ করে আমিও হাসলুম।

দেবদ্যুতিকে লক্ষ্য করে তনু বলল ঃ কিছু যদি মনে না করেন, তো একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি।

জিজ্ঞেস করবেন বৈকি।

দেবদ্যুতি আগ্রহ প্রকাশ করল।

তনু বলল ঃ মাসিমাদের আপনি কোথায় আবিষ্কার করলেন ?

আবিষ্কারটা ওঁরাই আমাকে করেছেন।

স্পষ্ট ভাবে উত্তর দিল দেবদ্যুতি।

কাহিনীটি মুখরোচক হবে মনে করে আমরা সবাই উদ্‌গ্রীব হলুম। এ ভাব লক্ষ্য করে সে তার গল্প শুরু করল ঃ

ছোট খাট চূণের যে একটা কারবার আমার আছে, তা জেনে গেছেন। তা থেকে ছেটাবার মতো মুঠো মুঠো অর্থ না এলেও যা আসে, তাতে একজনের প্রয়োজন মেটবার পরেও কিছু উদ্বৃত্ত হয়। বছর খানেক আগে একটা গভর্নমেণ্ট কন্ট্রাক্ট নিয়ে আপনাদের মেসোমশাই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে যেতে হয়। মিনিট কয়েক লেগেছিল কাজ চুকতে, কিন্তু ভদ্রলোক আমায় ছাড়তে চাইলেন না। চায়ের নিমন্ত্রণ হল, এবং এই উপলক্ষ নিয়েই মিসেস ও মিস মুখার্জির সঙ্গে আলাপ। প্রথম দিনেই মিসেস মুখার্জির একটা বিশেষ রূপ আমার চোখে পড়েছিল। সেটি আমার সঞ্চিত অর্থের প্রতি তাঁর অবিমিশ্র শ্রদ্ধা। আমি অবিবাহিত এবং ধনী। এ সংবাদ তাঁরা পূর্বাহ্ণেই সংগ্রহ করেছিলেন। আমি দেখলুম, জীবনের খেলায় যে

অর্থকে উঁচুতে স্থান দিতে শিখিনি, সেই অর্থই আমাকে এ পরিবারের প্রিয়পাত্র করে তুলছে। আমার আর একটি জিনিষ তাঁরা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সেটি আমার বিলিতি আবহাওয়া। ব্যবসার খাতিরে ধরেছিলুম ইংরিজি ভাষা। বাঙলায় যখন কাজ চলবে না, তখন অন্য কোন ভারতীয় ভাষার চেয়ে ইংরিজিটাই সহজ বলে মনে হয়েছিল। আর বিলিতি পোষাক ধরেছিলুম কাজের সুবিধার জন্য। কারখানার কুলির কাছে পাৎলুন যে বিলাস নয় তা মানবেন। পাহাড়ে হাওয়ায় আরামপ্রদও বটে। আমার মধ্যে যদি কোনো বিলিতি ভাব এসে থাকে, তো তার উৎস আমার অন্তরে নয়, বাইরের প্রয়োজন আমাকে সাহেব করেছে।

নিতা কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল ইশারা করে তাকে থামিয়ে দিলুম। দেবদ্যুতি বলল : ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টাও আমার দিক থেকে আসেনি। প্রথমটায় আমি লজ্জাই পেয়েচি। কেন না, মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যা আমার চিরকালের সংস্কারে আঘাত করত। মিথ্যা বলচি না মিসেস শোলাপুরকার, ছোট খাট ছুটিগুলো আমার নির্জন বাঙলোয় কাটাবার জন্য নিমীলাকে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন আপনাদের মাসিমা।

একটু থেমে বলল : আমি থাকি পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট জায়গায়। ষ্টেশন আর পোষ্ট অফিসের কয়েকজন কর্মচারী ছাড়া এ জায়গায় আর অন্য ভদ্রলোকের বাস নেই। কারখানার কুলিরা থাকে খানিকটা দূরে একটা বাড়িতে। সামনে দিয়ে একটা সরু রাস্তা উত্তরে আরও খানিকটা এগিয়ে গেছে। দিনের বেলায় গাড়ি চলাচল করে দুয়েকখানা। রাত্তিরে নিঃসাড় পড়ে থাকে। পেছনে শুকনো নদীর পাথুরে বেডের পাশে আমার কারখানা। অন্ধকারে

সেটা ভূতের রঙ্গমঞ্চ। অকারণেও সেখান থেকে ধুপ ধাপ শব্দ ওঠে। আমার বাড়ীর নিচের তলাতে ঠাকুর আর চাকর হল্লা করে। মধু ছাড়াও দুটো লোক আছে। একটি গাড়োয়ালী ব্রাহ্মণ, আরেকটি মালি, সেটি পাঞ্জাবী। নিজের নিঃসঙ্গ জীবনটা সচল রাখবার জন্যে একটা রেডিও আছে, আর কিছু বই। আত্মরক্ষার জন্যে একটা বন্দুকও আছে। ছুটির দিনে তা দিয়ে পাখি শিকার করেও সময় কাটানো চলে।

নিমীলা এলে রেডিওটা খুলে দিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় আমার পাশে এসে বসত। বিলিতি গান শুনত। আর বলত বিদিশি গল্প। যে দেশ দেখেনি, তার সামাজিক রীতির ভেতর মানবতার সন্ধান পেয়েছে তারা। আর নিজের দেশের দীনতার ভেতর দেখেছে হীনতার ঘৃণা প্রকাশ। যুক্তিহীন মত, তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে শুধু মূর্খ প্রতিপন্ন হয়েছি।

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মা অনেক সময় নিজেও আসতেন। বলতেন, মিলু বলে, জায়গাটা নাকি ভারি সুন্দর। তাই দেখতে এলুম।

যাঁরা দু দিনের জন্য আসেন, তাঁদের ভালো লাগবারই কথা। পাহাড় এখানে ঠিক উত্তরে নয়, খানিকটা পূবে। তাই সূর্য ওঠে পাহাড়ের পেছন থেকে। পায়ের দিকের জানালাটা রোজ খুলে রাখি। প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের দৃশ্য দিয়েই আমার দিনের কাজ শুরু হয়। যেদিন মেঘে সব ঢাকা থাকে, সেদিন মনটাও আমার ভারি হয়ে যায়।

মেঘ ভাল লাগে অন্য সময়। ঈশানের দিগন্ত থেকে যখন ঝড়ের মেঘ ওঠে, দূরের বস্তিতে শুরু হয় চেঁচামেচি। কারও দুরন্ত ছেলেটা তখনও ফেরেনি। কারও একটা মোষ কিছুতেই খুঁজে পাওয়া

যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে পশ্চিমের আকাশটা আসে হলদে হয়ে, মাথার ওপরের মেঘ জমতে জমতে ঝুলে পড়ে, শির শির করে কেঁপে ওঠে ঝাউ-এর হাল্কা ডাল পালা। ঝড় আসে নদীর বুক বেয়ে, শুকনো বালি উড়িয়ে। কখনো একটা চড়ুই বারান্দায় এসে আছড়ে আছড়ে পড়ে, কখনো একটা পাথর গড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে। যখন ঝড় কমে, তখন শুরু হয় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। গুড়গুড় করে ডাকে আকাশের মেঘ আর হাওয়ার সঙ্গে নেতিয়ে পড়ে সোঁ সোঁ করে কাঁদে পাহাড়ের ঝাউ।

এক সময় জল নামে নদীতে, কূল ছাপিয়ে আমার তারের বেড়া পর্যন্ত জল উঠে আসে! পরদিন সকালে উঠে দেখি, ঝড় নেই, জলও নেই। নদীর শুকনো বুকের ভেতর তার কঠিন পাঁজরাগুলো আগের মতোই জেগে আছে। মনে হবে, রাতে বুঝি দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

স্পষ্টই দেখতে পেলুম, বর্ণনার ভেতর দেবদ্যুতি নিজেকে হারিয়ে ফেলেচে। তাকে জাগিয়ে দেবার জন্যে বললুম: কখনো তোর কাছে গেলে এসব নিজের চোখেই দেখে আসব।

এইবারই তোকে নিয়ে যাব: দেবদ্যুতি জবাব দিল: একা আর সব কাজ পেরে উঠচি না।

তনুকে লক্ষ্য করে বলল: আপনারা নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ করছেন। ভাবচেন, লোকটা নিতান্তই স্বার্থপর, নিজের সুখের জন্যে নশো সাতানব্বুই মাইল টেনে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের বন্ধুকে। কিন্তু কি করি বলুন। বিশ্বপতির মতো একজন সঙ্গী না পেলে আমার ব্যবসা হয়তো ডুবে যাবে।

হেসে বললুম: ঠিকই তো। বিশ্বপতির মতো ঝানু ব্যবসাদারের সাহায্য না পেলে তোর ব্যবসাটা ভাল করে ডোবে কী করে?

সবাই হেসে উঠলেন।

তমু বলল: আপনার গল্পটা শেষ করুন।

দেবদ্যুতি কোন ভূমিকা করল না। বলল: মিসেস মুখার্জির একান্ত অনুরোধে মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর কাছে আম্বালায় যেতে হত। পথ দীর্ঘ নয়! কাজেই দূরত্বের দোহাই দিয়ে বাড়িতে বসে থাকা চলে না। এখানে একটি কথা না বললে অন্যায় হবে। নানা স্থানে নানা পরিস্থিতির ভেতর কোনো একটি মেয়েকে নিতান্ত নিবিড়ভাবে কাছে পেয়েও তার সম্বন্ধে উদাসীন আছি, জোর করে একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তপস্যাতে অতিমানব নই যে এই রূপরস গন্ধভরা বিরাট বিশ্বকে উপেক্ষা করে আত্মার মধ্যে পরমানন্দের সন্ধান করব। নিমীলাকে আমার ভাল লেগেছিল, আর এই ভাল লাগাটাই কি স্বাভাবিক নয়?

একটু থেমে বলল: এর পরের ঘটনা খুবই সাধারণ। মিস্টার মুখার্জি একদিন বিবাহের প্রস্তাব করলেন। আমি প্রস্তুত ছিলুম। তবু একটুখানি আপত্তি জানালুম। 'পৃথিবীতে কোনো আত্মীয় বন্ধু তো আমার মনে পড়চে না, যদি কোন দুর্ঘটনায় হঠাৎ মৃত্যু ঘটে—' কথাটা শেষ করতে দিলেন না ভদ্রলোক। আমার পিঠ থাবড়ে বললেন, 'that's silly excuse my dear boy. এই যদি তোমার আপত্তির কারণ হয়, তাহলে তোমার সম্মতি আছে বলেই আমি মনে করলুম'। এর পরে বাড়ির লোকের পর্যায়ে আমাকে উন্নীত করা হল।

সে সময়টা আমি অত্যন্ত বেশি সিগারেট খাচ্ছিলুম, আর

কাশছিলুম। এমন কি অ্যামেচার স্মোকারদের মতো প্রায় প্রতি টানেই আমি কাশতুম। কথার মাঝখানে কাশতে দেখলে মিলু ভারি বিরক্ত হত, বলত, 'কেন যে এতো সিগারেট খাও, বুঝতে পারিনে।' আমি বলতুম, 'এ বনেদী কাশি, সিগরেট ছাড়লেও কাশি আমায় ছাড়বে না।'

মোটরের হর্ন শোনা গেল বাইরে। চেরা পর্দার ফাঁক দিয়ে নিতা কিছু দেখতে পাচ্ছিল। বলল: নিমীলা আর মাসিমা আসচেন নির্মাল্যবাবুকে নিয়ে।

ডাক্তার শোলাপুরকার এগিয়ে গেলেন।

আমার দিকে চেয়ে দেবদ্যুতি বলল: নির্মাল্যবাবুটি কে?

গলাটা আর একটু নামিয়ে বলল: এবারের জালে বুঝি ইনিই ধরা পড়েচেন?

আমি জবাব দিলুম না।

দেবদ্যুতি বলল: তোর কাছে আমার অনেক ঋণ হয়ে গেল বিশু। তুই দৃষ্টি ধার না দিলে আমার বহুদিনের দুর্বলতাটুকু এমন আনায়াসে ঝেড়ে ফেলতে পারতুম না।

গাড়ি-বারান্দায় মোটর দাঁড়াবার শব্দ পাওয়া গেল। দরজা খুলে নামলেন সবাই। দেবদ্যুতি তখন জোরে জোরে কাশতে শুরু করেছে।

তনুও এগিয়ে গিয়েছিল। খানিক পরে সবাই যখন ঘরে এসে ঢুকলেন, কাশির তোড়ে দেবদ্যুতি তখন নেতিয়ে পড়েছে। জবাফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে তার ফর্সা মুখ।

মাসিমা আঁৎকে উঠলেন, দু পা পিছিয়ে গেল নিমীলা।

আমি উঠে গিয়ে তাকে সোজা করে বসিয়ে দিলুম। তনু ছুটে এল তাকে সাহায্য করবার জন্য।

মাসিমারা দাঁড়িয়েছিলেন। মুখ তুলে দেবদ্যুতি বলল: ভালই হল আপনারা এসেচেন। আমি ভাবছিলুম, আপনাদের সঙ্গে আর বুঝি দেখা হল না।

সেকি কথা, সেকি কথা।

খানিকটা সামলে নিয়ে মাসিমা হাসবার চেষ্টা করলেন।

দেবদ্যুতি আর তাঁর উত্তর দিল না। বলল: তোর রুমালটা দেখিতো!

বলে তার বাঁ হাত দিয়ে আমার রুমালখানা বার করে নিল। নিজের মুখখানা ভাল করে মুছে রেখে দিল আমার পকেটের ভেতরেই।

তার পকেটেও রুমাল ছিল, কাজেই এ অভিনয়টুকু বোঝা শক্ত হল না।

দেবদ্যুতিকে সুস্থ হতে দেখে তনু গেল মাসিমার কাছে, বলল: দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মাসিমা, বসুন!

বলে নিমীলার দিকে চাইল।

দাঁড়িয়ে ছিলেন সবাই, কিন্তু উত্তর দিলেন মাসিমা। তনুর কাঁধে একখানা হাত রেখে বললেন: আজ আর বসব না তনু। আজ জরুরী কাজ আছে। বিশ্বপতিবাবুর কাছে একটা দরকারে এসেছিলুম।

আমি আগ্রহ প্রকাশ করলুম না, যেন শুনতেই পাইনি তাঁর কথা। বসবার জন্যেও কেও আর অনুরোধ করলেন না। তনু তাদের গাড়িতে পৌঁছে দিতে গেল।

তার বাঁ হাতটা আমার পকেটের ভেতর চালিয়ে দিয়ে দেবদ্যুতি পাগলের মতো হেসে উঠল। কাঁচের সার্সিগুলোও কেঁপে উঠল তার হাসিতে।

আমি নিশ্চয় জানতুম যে এ হাসির শব্দ তাঁরা গাড়িতে বসেই পেয়েছেন। রাগ হল এই অসভ্যতার ওপর। বিরক্তভাবে বললুম: আর একটু ধৈর্য ধরতে পারলিনে হতভাগা!

আমার রুমালখানা এবারে নিজের পকেটে পুরে বলল: দেখলি তো, ভূত দেখে পালিয়ে গেলেন যেন।

ভয় পাওয়াই তো স্বাভাবিক!

আমি তেমনি রুষ্টস্বরে জবাব দিলুম।

দেবদ্যুতিও খিঁচিয়ে উঠল, বলল: তবে তুই কেন মরতে এসেছিস!

নিতা হাসছিল আমাদের কথা শুনে। তনুরাও ফিরে এল।

হঠাৎ কী হল দেবদ্যুতির জানিনে। উঠে গিয়ে তনুর পায়ের ধুলো নিল। বলল: আমায় ক্ষমা করবেন দিদি। আপনার ঘরে বসে ওঁদের তাড়িয়ে দিলুম, এই আমার দুঃখ। বেত চালাবার লোভটুকু ছাড়তে পারলুম না।

তনু কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। বসে বসে হাসছিলেন ডাক্তার শোলাপুরকার!

দেবদ্যুতি একটা সিগারেট ধরাল, বলল: প্রাণের ভয়ে অনেকদিন ভাল করে সিগরেট খেতে পারিনি।

খানিকটা ধোঁয়া নিয়ে বলল: এক সময় কতো তুচ্ছ ভাবতুম নিজের প্রাণটাকে। কিন্তু যেদিন প্রথম জানলুম যে আমাকে মরতে হবে সেইদিনই প্রাণের মায়া বুঝলুম। মনে হল, জীবনের সর্বস্ব

দিয়েও যদি নিজের প্রাণটুকু রক্ষা করতে পারি তো সেই হবে আমার সবচেয়ে বড় সাফল্য।

জামার নিচে হাতের একটা মাদুলি দেখিয়ে বলল: ছেলেবেলায় এইটে পেয়েছিলুম। অপঘাতে যাতে জীবন না যায়, সেইজন্যে এই সতর্কতা।

বড় ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছিল তনুর মুখখানি। বলল: একটা খবর এখনও আপনাকে দেওয়া হয়নি দেবদ্যুতিবাবু।

হাতজোড় করে দেবদ্যুতি বলল: বাবু নয়, শুধু দেবদ্যুতি।

সবাই হাসল তার ভাব দেখে।

তনু বলল: মাসিমার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটিকে দেখলেন, আমরা তারই সঙ্গে নিতার বিবাহ স্থির করেছি। সামনের সপ্তাহেই এদের আশীর্বাদ হবে।

দেবদ্যুতি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। একটু ভেবে বলল: আপনাদের মাসিমারা আসবার আগেই বোধ হয় এ ব্যবস্থা হয়েছিল?

তনু তার সন্দেহকে সমর্থন করল।

টেলিফোন বাজল পাশের ঘরে, ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

চিন্তিতভাবে দেবদ্যুতি বলল: আমার মনে হয়, এ বিয়ে হবে না। আপনারা অন্য পাত্র দেখুন।

তনু স্তম্ভিত হল না। যেন এমনি কোন মন্তব্য শোনবার আশঙ্কা

করছিল মনে মনে। বলল: কেন এমন সন্দেহ করচেন বলুনতো?

নিতাকে লক্ষ্য করে দেবদ্যুতি বলল: আপনার সামনে হয়তো আমার বলা উচিত হবে না মিস শোলাপুরকার, ভদ্রলোককে দেখে আমি খুব ইম্প্রেস্ড্ হইনি, তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাব আছে বলেই আমার মনে হল। ওরা তাঁকে নাকে দড়ি পরিয়ে ইচ্ছেমত খেলাতে পারবেন।

আমি স্পষ্ট দেখলুম, এক মুহূর্তে নিতার মুখের রক্ত সব মিলিয়ে গেল। বড় দুস্থ বড় অসহায় মনে হল তাকে।

দেবদ্যুতিও এ ভাব লক্ষ্য করল, বলল: আমার সন্দেহ যদি মিথ্যে হয়, তাহলেই আমি খুশি হব। মিস শোলাপুরকার আমাকে ক্ষমা করবেন।

তনু যেন আরও কিছু শুনতে চায়। এমনি দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তাকে নিরাশ করল না দেবদ্যুতি। বলল: ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই ওদিকে ঝুঁকে পড়েচেন বলে মনে হল।

তনুও কি এমনি কিছু সন্দেহ করতে শুরু করেছে! তাকাল আমার দিকে। বললুম: আমিও কিছু গোপন করেচি তোমাদের কাছে। আজ আর লুকনো উচিত হবে না। ঘটকালির জন্যেই আমাকে তারা খুঁজচেন। সেদিন বলছিলেন, 'নির্মাল্যের বন্ধু আপনি, বন্ধুরাই এ সব কাজ ভাল পারেন।'

দুচোখ বিস্ফারিত করে তনু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, কথা কইতে পারল না। দৃষ্টিতেও আজ বেদনা দেখলুম।

ডাক্তার শোলাপুরকার ফিরে এলেন, বললেন : নির্মাল্যের বাবা এ সপ্তাহে আসতে পারবেন না জানিয়েছেন। তাঁর বাতের ব্যথাটা আবার বেড়েচে। কাজেই আশীর্বাদের দিন কিছু পিছিয়ে দিতে হবে।

দেবদ্যুতি শুধু একটুখানি হাসল। ঘরের আর সবাই যেন আমরা মরে গেছি।

দার্জিলিঙের মরসুম তখনও শুরু হয়নি। কাজেই ট্রেনে জায়গা পাওয়া গেল। তনুরা ষ্টেশনে এল আমাদের তুলে দিতে।

নিতা বলল: আপনারা তাহলে সত্যিই যাচ্ছেন?

বললুম: না গিয়ে আর উপায় নেই। দেবু একবার যা স্থির করে, তা না করে আর ছাড়ে না।

দেবদ্যুতি তখুনি আপত্তি জানাল, বলল: মিথ্যে বলিস না বিশু, আমিও মত বদলাই। নিমীলাকে হারাবার কথা কি কদিন আগে ভাবতে পারতুম!

বলে হাসল খানিকটা, বলল: উঃ ধনে প্রাণে বেঁচে গেছি।

সবাই হাসল তার কথার ভঙ্গী দেখে।

তনু বলল: পৌঁছে তোমাদের ঠিকানা পাঠিও বিশুদা আমাদেরও যদি হাওয়া বদলের দরকার হয়, তোমাদের যেন খুঁজে বার করতে পারি।

দেবদ্যুতি বলল: পাঠাব বৈকি। স্বাস্থ্যের জন্যে না হলেও মনের জন্যে যে দরকার হবে, তা আমি নিশ্চয়ই জানি।

বললুম: আমার আরেকটি বন্ধুকেও ঠিকানা পাঠাতে হবে

দেবদ্যুতি আমার মুখের দিকে চাইল। বললুম সে বেচারা

আমার জন্যে চাকরির চেষ্টা করচে। নিয়োগপত্র যদি নিতান্তই আসে, যথাস্থানে সেটা পাঠাতে হবে তো!

নিজেকে সামলে নিয়েছে নিতা, হেসে প্রশ্ন করল: কোনো হোটেলের ম্যানেজারি নাকি?

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছি, বললুম: তাহলে তো খেয়ে বাঁচতুম। অমন ভাগ্যবানের কাজ কি আমার ভাগ্যে জুটবে! এ হল অর্থ শাস্ত্রের একজন সামান্য অধ্যাপক পদ।

তনু খুসি হ'ল, বলল: সে তো চমৎকার কাজ বিশুদা, তোমার যোগ্য কাজই বটে।

বললুম: বিপদও আছে তাতে। সেই অর্থনীতির পণ্ডিতের কথা মনে নেই? খরচের ভয়ে সারা জীবন যিনি বিয়ে করলেন না? তারপর বায়াত্তর বছর বয়সে নিজের বুড়ি ঝিকে বিয়ে করলেন ছ টাকা মাইনে বাঁচাবার জন্যে।

এক সঙ্গে সবাই হেসে উঠলেন।

এখন আর সোজা পথে দার্জিলিঙ যাবার উপায় নেই। অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয় পাকিস্তান ডিঙোতে হলে। আমরা তাই ঘোরা পথে পাহাড়ে উঠলুম।

প্রথমে একটা হোটেলে উঠেছিলুম। কার্ট রোডের ওপর ছোট হোটেল, খানিকটা নিরিবিলি। ব্যবহার ভাল, ব্যবস্থাও খারাপ নয়। কিন্তু দেবদ্যুতির ভাল লাগল না। সামনের বাড়িটা যাঁরা ভাড়া নিয়েছিলেন, বর্ষার উৎপাতে তাঁরা পালিয়ে গেলেন। যৎসামান্য ভাড়ায় সে বাড়িখানা পাওয়া গেল।

ঘরের সংখ্যা সব সুদ্ধ আটটি। বসবার ঘর, পোষাক পরবার

ঘর, দু'খানা শোবার ঘর, রান্না ঘর, খাবার ঘর, স্নানের ঘর ও পায়খানা। শোবার ঘরে একজন শোবার খাট দুখানা পাতলেই চলা ফেরা করা মুস্কিল হয়ে ওঠে, তিনখানা পাতলে দরজা থেকেই খাটে উঠতে হয়। খাবার ঘরে টেবিল রাখলে দুখানা চেয়ার পাতা যায় না, আর চেয়ার রাখতে চাইলে তাদের টেবিলের নিচেই ঢুকিয়ে রাখতে হয়। বসবার ঘরখানা এর চেয়ে কিছু বড়, অর্থাৎ বনাত ঢাকা লেখবার টেবিলটার ওপর খবরের কাগজ পেতে দিব্বি খাওয়া চলে।

পশ্চিম দিকে দেড় হাত চওড়া এক ফালি বারান্দা আছে। সে পথে কয়লাওয়ালা আসে, 'নানি'ও যাতায়াত করে, আবার জমাদার সাহেবেরও পথ এটি!

সকালে বেড়িয়ে ফিরে আমরা যখন খেতে বসি, সামনে দিয়ে ডাক গাড়ি যায়। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যারা বসে থাকে আমাদের খেতে দেখে তারা আনন্দ পায়।

ভোরবেলায় রান্না ঘরের জানালা দিয়ে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখি। এ সময়টায় হোটেলে বেশ সাড়া পড়ে। পুরুষেরা রাতে শোবার পায়জামার ওপর কেউ ওভার কোট কেউ ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে, মেয়েরা কেউ শাল কেউ ক্লোক গায়ে ছুটোছুটি করতে শুরু করেন।

'এই যে, এখান থেকে বেশ দেখা যাচ্চে।'

'না না, এইখান থেকে আরও চমৎকার।'

'ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখবে? এদিকে উঠে এসো না!'

'ও কুঁড়েটার কথা আর বলিসনে, ডাকাডাকি করতে উত্তর

দিলে, 'সারাদিনই তো পাহাড় দেখছি, তার জন্যে এমন হ্যাংলামি কেন?'

'এমন লোকের এখানে না আসাই উচিত।'

'কাঞ্চনজঙ্ঘার বাঁ দিকে ঐ চূড়োটার কী নাম?'

'ওটা? ওটা কাব্রু।'

'কাব্রু বাঁ দিকে কেন হবে মশাই! কাব্রু তো ডান দিকে।'

'তবে ওটা কী?'

'ওটা জান্নু, ইন নেপাল।'

মধু এসব কৌতূহলের কারণ খুঁজে পায় না। বলেঃ পাহাড় দেখবার জন্যে মানুষ যে এমন পাগল হয়, এখানে এসেই তা প্রথম দেখচি।

যা কিছু দেখবার ও জানবার ছিল, কয়েকদিনেই তা দেখা ও জানা হয়ে গেল। বেড়াবার উৎসাহ কমে আসতেই দেবদ্যুতি বললঃ দাবা খেলা জানিস?

বললুমঃ হারতে জানি।

দেবদ্যুতি খুশি হয়ে বললঃ তাহলেই হবে। আমারও জেতার অভ্যাস নেই!

কিন্তু এক সেট দাবা বোড়ে সংগ্রহ করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল। দিন দুএকের অক্লান্ত অনুসন্ধানের পর দারোগা-বাজারের ছোট্ট একটা দোকানে কাগজের একখানা ছক ও লাল নীল কাঠের ঘুঁটি আবিষ্কার করা গেল। দাম যা নিল, তাতে দাঁতের বড় একটা সেট হতে পারত।

সেই থেকে আমাদের দিন কাটছে ভাল। এক মধুই মাঝে মাঝে রসভঙ্গ করে, তা না হলে আর কোনও উপদ্রব নেই।

বোড়ের মুখে ঘোড়ার একটা কিস্তি দিয়ে দেবু বলল: সামলা দেখি এবারে!

বললুম: ঘোড়াটা যে মারা যায়!

দেবু চমকে উঠল। বলল: কী করে?

কথা না বলে বোড়েটা দেখিয়ে দিলুম। খপ করে ঘোড়াটা তুলে নিয়ে বলল: না না, এ চাল আমি দিইনি।

বললুম: বারে বারে চাল ফেরানো কিন্তু উচিত নয়।

দেবদ্যুতি চটে উঠল, বলল: চাল ফিরিয়ে নিচ্চি মানে? যতক্ষণ তুমি না চালচ, ততক্ষণ ইচ্ছে মত ও আইনত আমি যা খুশি তাই করতে পারি।

মধুর হুঙ্কার শোনা গেল রান্নাঘর থেকে, বলল: দয়া করে তোমাদের ছকটা এবারে গোটাবে কি? ভাত যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

ঘোড়াটা দেবদ্যুতির হাতেই ছিল, কোথায় বসাবে ভাবতে ভাবতে বলল: ভাত কখনো জল হতে পারে না মধু, আমরা ছেলেমানুষ নই যে বোকা বোঝাবি?

মরণ আমার: মধু জবাব দিল: জল মানে কি সত্যই জল নাকি!

তবে উনুনের পাশে বসিয়ে রাখ না।

দেবদ্যুতি পরামর্শ দিল।

ওধারের বাঁকের কাছে রেল গাড়ীর বাঁশি শোনা গেল। মধু এল

দরজার কাছে, বলল : এই নিয়ে চারবার বললুম। এবারেও যদি না খাও তো তোমাদের ভাত ঢেকে রেখে আমরা খেয়ে নিচ্ছি। সেই থেকে 'নানি'টা বাড়ি যাবার তাড়া দিচ্চে।

ঘোড়াটা কিছুতেই আর বাঁচে না, চিন্তিত ভাবে দেবদ্যুতি বলল : তুই বড় বিরক্ত করিস মধু।

আমি হেসে বললুম : তুমি খাবার আনো মধু, আমাদের হয়ে গেছে।

বলা মাত্র কাজ। এক টানে মধু দাবার ছকটা টেবিলের এক ধারে সরিয়ে রাখল। হাঁ হাঁ করে উঠল দেবদ্যুতি। মধুর ততক্ষণে খবরের কাগজ বেছানো হয়ে গেছে। খাবার আনতে যাবার সময় বলে গেল : কিছুই নষ্ট করিনি তোমাদের। খেয়ে নিয়ে যতো ইচ্ছে খেলো।

ট্রেন তখন আমাদের ঠিক সামনে দিয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে যাত্রী দেখা আমাদের অভ্যাস। আজ খাবার নেই, তাই মনোযোগ বেশি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলো প্রায় ফাঁকাই যায়। তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্য এঁরা মোটরে কিম্বা বাসে আসেন। দুয়েকজন প্রবীণ যাঁরা মোটরে ভয় পান আর যাঁরা প্রথম পাহাড় দেখছেন, তাঁরাই আসেন ট্রেনে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা আসেন কাছাকাছি স্থান থেকে।

আজ প্রথম শ্রেণীর যাত্রী কিছু বেশি মনে হল। সেদিকে তাকিয়ে দেবদ্যুতি বলল : মিসেস শোলাপুরকারকে দেখলুম যেন!

বললুম : ঠিক দেখেছিস?

বোধ হয় সারপ্রাইজ দেবার মতলব আছে।

দেবদ্যুতি উত্তর দিল।

আমিও যেন তনুকে দেখতে পেয়েচি। উঠে দাঁড়িয়ে বললুম: আমরাই বা কম কিসে!

দেবদ্যুতি তার চামড়ার জ্যাকেটটা চড়িয়ে নিল, আমি কাঁধে ফেললুম আমার মোটা ভুসখানা।

খাবার হাতে মধু ঘরে ঢুকছিল। দেবদ্যুতি বলল: একটু অপেক্ষা কর মধু, ষ্টেশন থেকে আমরা এখুনি আসচি।

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মধুর আফশোসটাও শোনা গেল: অপেক্ষা করেই তো চুল পাকিয়েচি। এবারে মরবার অপেক্ষা।

ষ্টেশন এখান থেকে এক মিনিটের রাস্তা। আমরা যখন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছলুম, যাত্রীরা তখন নেমে পড়েছে। শুরু হয়েছে প্রচুর চেঁচামেচি, হাঁকাহাঁকি। ডাক্তার শোলাপুরকার একখানা মোটর ঠিক করেছিলেন। আমাদের দেখতে পাননি। নিতা ও তনু এক সঙ্গে কলরব করে উঠল: এই যে, আপনারা কোথায় খবর পেলেন?

মোটরের ভাড়া ঠিক করে ভেতরে এসেই ডাক্তার বিমর্ষ হয়ে গেলেন। বললেন: এ নিশ্চয়ই তনুর কীর্তি।

নিতা বলল: বৌদির জন্যে সব মাটি হয়ে গেল।

দেবদ্যুতি বলল: সে সব পরে হবে। এখন চলুন তো, আপনাদের পেটেও নিশ্চয়ই আগুন জ্বলচে।

ডাক্তার বললেন: ঐ গাড়িটা ভাড়া করেচি।

দেবদ্যুতি বলল : না না, ওতে সুবিধা হবে না। ঐ বাঁকটার কাছে ভাল গাড়ি পাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যেই পাহাড়ী মেয়েরা জিনিষপত্র সব কপালে দড়ি বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে। তাদের অনুসরণ করতে বলে দেবদ্যুতি এগিয়ে চলল। তারা কোথায় উঠবেন, তা জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজনই বোধ করল না।

গাড়ির ড্রাইভার মহা গোলমাল শুরু করেছিল। আমি ফিরে দাঁড়াতেই চুপ মেরে গেল।

নিতা হেসে ফেলল, বলল : শরীরটা কাজ দিল, এই প্রথম দেখলাম।

বাঁকের কাছে এসে ডাক্তার চিন্তিত হলেন, বললেন : মাইল খানেকের ভেতর তো কোনো গাড়ি দেখছিনে।

দেবদ্যুতি বলল : কী আশ্চর্য, দেখতে পাচ্চেন না? এই তো এই সামনেই।

ডাক্তারকে সমর্থন করল তনু, বলল : কই, আমরাও তো কিছু দেখতে পাচ্চিনে।

দেবদ্যুতি থেমে পড়ল, বলল : দেখতে পাচ্চিনে মানে! পৌঁছেই তো গেলুম! ওরে ও মধু!

কুলিদের দিকে ফিরে বলল : ওরে যা তোরা, মালপত্র ভেতরে নিয়ে যা!

হতভম্বের মতো চেয়ে রইলেন ডাক্তার শোলাপুরকার।

দেবদ্যুতি তনুকে বোঝাতে শুরু করল তাদের সুবিধার কথাটা : মস্ত বাড়ি তনুদি, সবাই মিলে দিব্বি আনন্দে থাকা যাবে।

তার আড়ম্বরহীন সহজ আত্মীয়তায় তনু মুগ্ধ হল, কিন্তু কী বলবে ভেবে পেল না। নিতা এগিয়ে গিয়েছিল। বলল: উঠে এসো না বৌদি!

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাক্তার তবু ইতস্তত করছিলেন, একটা ঠেলা দিয়ে দেবদ্যুতি তাঁকে বারান্দায় তুলে দিল।

নিতা ততক্ষণে সমস্ত বাড়িটা ঘুরে এসেছে, বলল: আপনার বাড়িটা দেখচি ঠিক আমাদের হল ঘরটার সমান।

রাগের ভান করল দেবদ্যুতি। বলল: তার মানে? বাড়িটা কি আমার ছোট নাকি? এ পাড়ায় এর চেয়ে বড় বাড়ি আর নেই জানেন?

ভর দুপুরে পেট যখন চুঁই চুঁই করছে, এতগুলি অতিথি দেখে মধু তখন সন্তুষ্ট হতে পারল না। মুখখানা হাঁড়ি করে জিনিষপত্র ভেতরে নিতে লাগল।

তনুকে নিয়ে দেবদ্যুতি ভেতরে গেল। ডানদিক নির্দেশ করে বলল: এই আমাদের রান্না ঘর, আর এই বাঁ দিকে স্নানের। র‍্যাকে সাবান আছে। দড়িতে তোয়ালে ঝুলচে। চট করে হাতটা ধুয়ে নিয়ে আমাদের খাইয়ে দিন তো। বাইরে খাবার টেবিলে আমরা অপেক্ষা করচি।

বলেই স্নানের ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দেবদ্যুতি বাইরে ফিরে এল।

সামনের হোটেলের বোর্ডারেরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলেন। ম্যানেজারকে দেখতে পেয়ে দেবদ্যুতি রাস্তায় নেমে গেল, বলল: দুজনের খাবার দিতে পারেন ম্যানেজারবাবু?

ম্যানেজার দুঃখ প্রকাশ করলেন, বললেন: ফার্স্ট ক্লাস খাবার তো সব উঠে গেছে।

ক্লাসট্লাসের দরকার নেই ম্যানেজারবাবু। আমাদের মধু আর নানিটা খাবে। যা হোক কিছু খাইয়ে দিলেই চলবে।

ওদের খাবার জন্যে ভাবনা করবেন না: ম্যানেজারবাবু আশ্বাস দিলেন: আমার লোকেরাও এখনও না খেয়ে আছে।

ঘর থেকে আমি বললুম: তিনজনের খাবার লাগবে দেবু, এঁদের সঙ্গেও একজন লোক আছে।

ম্যানেজার আমার কথা শুনতে পেয়েছিলেন, বললেন: তিনজনকেই পাঠিয়ে দেবেন।

খাওয়া সেরে আমি শুয়ে পড়লুম।

এসে অবধি আমরা একটা ঘরেই শুচ্ছিলুম, আর একটা ঘরে আমাদের জিনিষপত্র ছেটানো থাকত। সেইটে লক্ষ্য করে নিতা বলল: বাড়িটা যে একেবারে গোয়াল করে রেখেছেন দেখচি।

শুয়ে শুয়েই আমি উত্তর দিলুম, বললুম: গরু যেখানে থাকে তাকে তো গোয়ালই বলে।

নিতা খুশি হয়েছিল আমার কথা শুনে, কিন্তু দেবদ্যুতির খাতিরে প্রতিবাদ করল, বলল: আমি কি তাই বলেচি নাকি?

বললুম: তাই বলোনি মানে? এত লোকের সামনে তুমি কথা ঘোরাচ্চ।

আশ্চর্য লোক আপনি: নিতা আফশোস জানাল: এমন নোংরা করে রেখেচেন, অথচ মুখ ফুটে কেউ তা বলতে পাবে না।

দেবদ্যুতি লজ্জিত হয়েছিল, বলল: দিন কয়েক থেকে মধুটা রাগ করে আছে, জামা কাপড় যা বার করচি তা আর তুলে রাখচে না।

মধু খেয়ে ফিরছিল। শুনতে পেয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল: কেন রাগ করবে না শুনি! সময় মত নাওয়া খাওয়া নেই। বেড়ানো নেই। বেলার মত বেলা বাড়চে, রাতের মত রাত—বসে বসে দাবাই পিটচেন দুজনে।

গলা নামিয়ে দেবদ্যুতি বলল : হাতে করে মানুষ করেচে কিনা, এসব গালমন্দ তাই নিঃশব্দে সইতে হয়।

নিতা বারান্দায় বেরিয়ে পড়ে ফিস ফিস করে মধুকে কী সব প্রশ্ন করল। বুড়োর চোখ দুটো যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, শুয়ে থেকেই দেখতে পেলুম। আঙুল দিয়ে কী একটা সে দেখিয়ে দিল। নিতাও তেমনি মৃদুস্বরে আবার একটা আশ্বাসবাণী শোনাল।

ডাক্তারের সঙ্গে এসেছে শিবচরণ। তাকে ডেকে নিতা বলল : এ ঘরটায় একবার এস তো শিবচরণ, একটু সংস্কারের চেষ্টা দেখা যাক।

দেবদ্যুতি ব্যস্ত হল, বলল : তার জন্যে অত তাড়া কিসের? আমার মধুই সব করে ফেলবে।

শিবচরণ করলেই বা দোষ কি?

নিতা জিজ্ঞেস করল :

দরজায় দাঁড়িয়ে ঘাড় চুলকোতে লাগল দেবদ্যুতি।

নিতা তৎক্ষণে কাজে লেগে গেছে, বলল : ও বাবা, এ কতো 'টাই' বার করেছেন দেবদ্যুতিবাবু? একট, দুটো, তিনটো, এই একটা চারটে, ওই আবার একটা—এযে সব হাঁড়ির ভেতর থেকে বেরচ্চে, এ আর বাঁধবেন কী করে? 'প্রেস' নেই?

করুণভাবে দেবদ্যুতি উত্তর দিল : ছিল তো একটা?

মধু এসে পড়েছিল, বলল : আমি বার করে দিচ্চি দিদিমণি।

ও ঘরে কাজ হচ্ছে। দেখতে না পেলেও ধৃতরাষ্ট্রের মতো শুনতে পাচ্ছিলুম। নিতা বলল : এই যে এই পাহাড়টার নিচে।

চোরের মতো দরজায় দাঁড়িয়ে দেবদ্যুতি তাদের কাজ দেখছিল।

নিতা বলল: আপনি বসুন না গিয়ে আপনার ডাইনো ড্রয়িংরুমে।

তার নতুন শব্দটায় ডাক্তার শোলাপুরকার বসবার ঘরে থেকেই হেসে উঠলেন।

এক সময় তনু এসে আমার পাশে বসল। বলল: কতগুলো জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে।

নিজে কথা না বলে তাকেই বলবার সুযোগ দিলুম।

তনু বলল: নিতার বিয়েটা ভেঙে গেল।

বিয়ে যে ভেঙে যাবে তাতে আমার বা দেবদ্যুতির কারও এতটুকু সন্দেহ ছিল না। তবু বললুম: ভেঙে গেল!

তনু বলল: তোমরা চলে আসবার দিন কয়েক পরেই নির্মাল্যের বাবা এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। ভদ্রলোকের ব্যবহার তো জান! নিতার হাত দু খানা ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। বললেন: কী করব মা, ছেলের জন্যে মাকে ছাড়তে হচ্ছে। উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বাতের ব্যাথাটা এখন কেমন?' ভদ্রলোক আশ্চর্য হলেন, বললেন, 'বাত? কই না, এবারে তো বেশ ভালই আছি।' একটু থেমে বললেন, 'নির্মাল্য বলেছে বুঝি?' কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন উনি, বললেন, 'না না, আমিই জিজ্ঞেস করছিলুম।' ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন, 'আপনার আর লজ্জা কী ডাক্তার সাহেব, ছেলেটা তো আমারই। আমি তাকে ভাল করেই চিনি।'

একটু থেমে বলল: অনেক কথাই প্রকাশ হল তাঁর কাছ থেকে। ছেলের আগ্রহেই তিনি অঘ্রানে বিয়ের প্রস্তাব করেন। তারই কথায় আশীর্বাদটা তাড়াতাড়ি সারতে চেয়েছিলেন। নিতাকে তাঁর নিজের

ভাল লেগেছে, নির্মাল্যের মায়েরও পছন্দ। আর আমাদের পক্ষ থেকেও যখন কোন অসম্মতি নেই, তখন বিয়েটা হতই। তার জন্যে তাড়াতাড়ি করবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নতুন কনে দেখলেন?' ভদ্রলোক উত্তর দিলেন নির্লিপ্ত ভাবে, বললেন, 'দেখেছি বৈকি। মেয়ের মায়ের তাড়াতেই দেখতে হল। কিন্তু ছেলের আগ্রহ ছিল না, সেখানে যেতে দেবার ইচ্ছেও ছিল না তার।' বললাম, 'মেয়ে পছন্দ হয়েছে তো?' দুঃখ করে ভদ্রলোক বললেন, 'মেয়েদের রূপটাই কি সব মা?' এ দেশের মেয়ের যা চিরকালের সম্পদ, সেই লজ্জা ভয় বিনয় ব্যবহার, মনের এ সব কোমল বৃত্তিকে যারা দুর্বলতা ভাবে, তাদের বিচার কি আমি পারি মা?'

এতক্ষণ আমি নিঃশব্দে তার কথা শুনছিলুম। এবারে প্রশ্ন করলুম নির্মাল্যের কথা। বললুম: নির্মাল্য কেন পিছিয়ে গেল জান?

তনু বলল: সেইটেই কেমন হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে বিশুদা, ঠিক ধরতে পাচ্ছিনে। প্রথমটায় মনে হয়েছিল, মিলুকে দেখেই বুঝি তার মাথা ঘুরে গেছে। কিন্তু পরে দেখলাম, তা সত্যি নয়। নির্মাল্যের বাবার কথাতেও তাই মনে হল।

একটু ভেবে বলল: আমার কী মনে হয় জান? মনে হয়, আমরা মহারাষ্ট্রী বলেই বোধ হয় সে ভয় পাচ্ছে।

বললুম: ভয় কিসের তার?

তনু বলল: হয়তো ভাবছে, বাঙালী সমাজের সঙ্গে নিতা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে না।

বললুম: সেও কি সম্ভব? তুমি পারোনি?

তনু বলল : আমার কথা ছেড়ে দাও, আমাকে তো শ্বশুর ঘর করতে হয়নি।

একথার উত্তর আমার জানা নেই। আমি গল্প লিখেছি নিজের মনের মতো করে। পরের মনের কথা ভেবে দেখবার চেষ্টা করিনি।

তনু বলল : বুঝলে বিশুদা, সত্যিকার মিলনের এও একটা বড় বাধা। ওর এক পাঞ্জাবী বন্ধু বিয়ে করেছিল নেপালের এক মেয়ে। দুজনে দুজনের হাত ধরে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে থাকত, কথা কইত না কেউ। উনি একদিন দেখে ফেলেছিলেন তাদের। তাতে ওর বন্ধু কী জবাব দিয়েছিল জান? বলেছিল সে পাঞ্জাবী। চেষ্টা করে সে বিহার পর্যন্ত আসতে পারে। কিন্তু তার নেপালী বউ বাংলার সীমানা ডিঙোতে পারে না। দুজনের কথা হয় ইংরিজিতে, তাতে কাজ চলে যায়, মন জানাজানি হয় না।

বললুম : নিতার বেলায় তো আর এ যুক্তি খাটে না। সে যে বাঙালী নয় এই সত্যটাই লোকে বিশ্বাস করবে না।

তনু বলল : ভাষাটাই কি সব বিশুদা? সমাজ সংস্কার বলে কিছুই নেই আমাদের? নেই কোনো কৃষ্টি বা স্বাতন্ত্র্যের বালাই!

বাধা দিয়ে বললুম : নিতার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেচ কি?

তনু বলল : করেচি বৈকি। তার জন্যেই তো এখানে আসতে হল। নির্মাল্যের ঠুনকো স্বভাব নিয়ে তোমরা অনেকে অনেক কিছু বলেছিলে, কিন্তু তাতে তার নিজের বিশ্বাস ভাঙেনি। সে ভেঙে পড়েচে তার বাপের মুখে ছেলের কথা শুনে। মেয়ে লেখা পড়া শিখেচে, সহজে সবার কাছে ধরা দিতে চায় না।

নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, বললুম : পাবেই তো দুঃখ, মেয়েলি মনটা তার যাবে কোথায় ?

তনু কথা কইল না, কিন্তু আমার আজ নতুন উপলব্ধি এল। মনে হল, নিতা-ই শুধু দুঃখ পায়নি, দুঃখ দিয়েছে আমাকেও। নির্মাল্যকে হারিয়ে কেন সে দুঃখ পাবে! এই অনুভূতির ভেতর কোথায় একটা কাঁটা আছে, নিঃশ্বাস নিতে সেটা আজ খচ খচ করে বিঁধছে।

ভালবাসা কেন স্বার্থপর হবে? তার নিঃস্বার্থ অজস্রতায় জগতের যত হানাহানি যত বিদ্বেষ বিসম্বাদ সব নিঃশেষ হয়ে যাবে, এই তো হবে ভালবাসার আদর্শ। ঈর্ষাকে চিরকাল ঘৃণা করেছি, প্রাণপণে দূরে ঠেলতে চেষ্টা করেছি তাকে। ব্যর্থতার গ্লানিতে আজ মন আমার ভরে গেল!

অনেকক্ষণ পরে তনু কথা কইল, বলল : তোমরা এই রকমই বিশুদা। তোমাদের ভাল লাগতেও সময় লাগে না। আবার দুদিন পর সেই ভাল লাগাকে পথের মাঝে ফেলে যেতেও কষ্ট হয় না।

একটু থেমে বলল : মেয়েরা অন্য উপাদানে গড়া। তারা ভালবাসে যেমন দেরীতে, তেমনি একবার বাসলে সারাজীবনেও তা ভুলতে পারে না। যে দেশের মেয়েরাও পুরুষদের মতো হাল্কা স্বভাবের, সেখানে দিনে হাজার হাজার মামলা, রুজু হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদের। সেখানে বিয়ে হয় না, হয় কিছুদিন একসঙ্গে থাকবার একটা কন্ট্রাক্ট। কোনো পক্ষই জানে না এই কন্ট্রাক্টের মেয়াদ কত দিন থাকবে।

এইবারে আমি আপত্তি জানালুম। বললুম : তোমার এ ধারণা

কোনো দেশ বা জাতিগতভাবে সত্য নয়। সব দেশের সব পুরুষরাই হাল্কা স্বভাবের আর আমাদের দেশের সব মেয়েরাই Constant এও কখনো সত্য হতে পারে না। বিদেশেও বিয়ে স্থায়ী হয়, আর এদেশেও বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের মন যায় ভেঙে। সেই ভাঙা চোরা মন দুটো জোড়াতালি দিয়ে একসঙ্গে থাকার চেষ্টার চেয়ে বিচ্ছিন্ন-ভাবে নতুন সংসার পাতাটাই ভালো নয় কি?

তনু যেন শিউরে উঠল, বলল: তোমরা বিয়ে করনি, তাই এমনি ভাব। আমরা কখনো ভাবিনে। অত্যন্ত অশান্তির দিনেও একথা আমাদের মনে আসে না।

বললুম: যে মেয়ে আট বছরে বিয়ে করে দুদিন বাদেই বাপের বাড়ি ফিরে এল বিধবা হয়ে, তার সারাজীবনের কৃচ্ছ্রতাকে তোমরা সম্মানের চোখে দেখ। যে স্ত্রী তার পঙ্গু স্বামীকে কাঁধে করে শুঁড়ির বাড়ি পৌঁছে দেয়, তাকে তোমরা সতীলক্ষ্মীর আদর্শ মনে কর। এর চেয়ে—

কথাটা শেষ করতে পারলুম না। বসবার ঘর থেকে ডাক্তার শোলাপুরকার হাঁক দিলেন: শুনচ! দেবদ্যুতিবাবু বলচেন যে তাঁর শরীর নাকি আগের মতই আছে, দার্জিলিঙের হাওয়ায় কিছু-মাত্র উন্নতি হয়নি। তোমারও এই মত নাকি?

কয়েক পা এগিয়ে গেল তনু, বলল: এই বিশ দিনে বিশ পাউণ্ড ওজন যে বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

টেবিল থাবড়ে ডাক্তার বললেন: ঠিক বলেচ, আমিও তাই বলছিলুম।

হাতের কাজ সেরে নিভা বেরিয়ে এল, বলল: এই পাহাড়ের ভেতর আপনার তেঃ কিছু দেখতে পেলাম না!

হেসে বললুম: কিছু থাকলে তো দেখতে পাবে। এক সময় সখ করে বাবা একটা গলাবন্ধ কোট করে দিয়েছিলেন, সেটা বাক্সেই তোলা থাকে। খদ্দরের পাঞ্জাবীটা গায়ে আর তুষখানা ঝুলচে মাটিতে। আবার কী চাই?

জোরে জোরেই বলেছিলুম কথাগুলো। বাইরের ঘর থেকে পুরুষেরা হেসে উঠলেন। তনু ব্যস্ত হল, বলল: এতেই শীত মানে তোমার?

হাসি সামলে দেবদ্যুতি বলল: না মেনে আর উপায় কী! ওর ঘে ড়া জেদের গর্ব তো কম নয়!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তনু বলল: এই এক ধরনের লোক সবাইকে অশান্তি দিয়ে যারা আনন্দ পায়।

দেবদ্যুতি উঁকি দিয়ে নিতার কাজ দেখে চেঁচিয়ে উঠল, বলল: এই জন্যেই তো ঘরটা আমরা এত নোংরা করে রেখেছিলুম, তাই না বিশু? একটু আধটু অপরিষ্কার থাকলে তো আর আপনার হাত পড়ত না!

না দেখেই আমি তারিফ করলুম: জয় হোক নিতার!

নিতা বলল: এবারে ঘরের ব্যবস্থা হোক। যেটা পরিষ্কার করা হোল সেটা মেয়েদের, আর যেটা নোংরা রইল সেটা আপনাদের। দাদা মেয়েদের সঙ্গেও থাকতে পারেন। আপনাদের কাছেও যেতে পারেন।

হাততালি দিয়ে দেবদ্যুতি তার সমর্থন জানাল।

নিতা এক সময় চেঁচিয়ে উঠল, বলল: শিগগির দেখে যাও বৌদি, নিচে থেকে কেমন মেঘ উঠচে!

উত্তরের জানালাটা খুলে দিতেই ধোঁয়ার মতো ধূসর মেঘে সমস্ত ঘরটা ভরে গেল।

তনু বলল : মেঘ তো এমনি করেই ওঠে।

নিতা বলল : আমার কিন্তু ভীষণ ভাল লাগে এই মেঘ ওঠা দেখতে।

বাইরে থেকে দেবদ্যুতি নিতাকে ডাকল : এদিকে দেখে যান মিস শোলাপুরকার।

নিতা ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। দেবদ্যুতি বলল : ঐ দেখুন ওপরের সাদা বাড়িগুলো আর একটাও দেখা যাচ্ছে না।

আশ্চর্য হয়ে নিতা বলল : ওমা তাইতো। এই একটু আগেও যে সব দেখতে পাচ্ছিলাম।

তনু বলল : ওদিকটায় বৃষ্টি হচ্ছে না।

নিতা বলল : এদিকটায় কই বৌদি? দেবদ্যুতি অন্য কথা বলল : মেঘ কেটে গেলে আরও মজা দেখতে পাবেন। ছাতা হাতে মেম সাহেবরা বেরিয়ে পড়বেন ওপরের রাস্তায়। তারা বলে এই মেঘ গায়ে লাগলে নাকি শরীর ভালো হয়, রঙও ফর্সা হয়।

এদের ছেলেমানুষী দেখে ডাক্তার শোলাপুরকার হাসতে লাগলেন। আমি আজ তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলুম না। কী একটা অদৃশ্য শক্তি আজ আমায় কাবু করে ফেলেছে। নির্মাল্যকে নিতা ভালবাসেনা, কোথা থেকে এ জ্ঞান জন্মেছিল জানি না। তবে নিতার কথায় ও ব্যবহারে এ ধারণা একদিন বদ্ধমূল হয়েছিল। তনুর কথায় আজ প্রথম নিজের ভুল বুঝতে পারলুম। গল্পে যখন মেয়েদের চরিত্র বর্ণনা করেছি, ভাবতুম, তাদের মনের কথাটিই

হয়তো লিখতে পেরেছি। আজ সে অহঙ্কার আমার ভেঙে গেল।

তুমি কি ঘুমলে বিশুদা?

তনু প্রশ্ন জানাল।

বললুম: হাটের মাঝে কুম্ভকর্ণই শুধু ঘুমতে পারে।

তবে একটু বেরবে, না অমন করে শুয়েই থাকবে?

বললুম: খালি পেটে আবার পাহাড়ে উঠতে বলচ?

দেবত্যুতির কানে গেল আমার কথাটা, সঙ্গে সঙ্গেই তর্জন করে উঠল: এইতো খেলি রাক্ষস!

নিতা ও ডাক্তার একসঙ্গে হেসে উঠলেন। সহানুভূতির সুরে তনু বলল: দাঁড়াও বিশুদা, একটু চা করে দিই, তারপর বেরনো যাবে।

শুয়ে শুয়েই আমি সম্মতি জানালুম।

## ( ২০ )

পরদিন চায়ের পর্ব চুকতে সকাল নটা বেজে গেল। নিঃশেষে তৃতীয় পেয়ালাটা শেষ করে দেবদ্যুতি নীরব হয়ে রইল, কিছুতেই সে আজ উৎসাহ পাচ্ছে না। কাল সন্ধ্যেবেলা মল থেকে ফিরে অবধি দাবার ছকটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লেখবার টেবিলের দেরাজ থেকে জলের স্যালামাণ্ডারটা পর্যন্ত খুঁজে দেখা হয়েছে। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। শূন্যে হাত জোড় করে মধু বলল, 'ভগবান এবারে মুখ তুলে চেয়েছেন।' দাবাটা সেই সরিয়েছে সন্দেহ করে দেবদ্যুতি তাকেই ধমকাতে লাগল। গম্ভীর হয়ে মধু বলল : 'সে ইচ্ছে থাকলে তো আগেই সরাতে পারতুম।' সত্য কথা। এ কাজ যে মধুর নয়, তা দেবদ্যুতিও বোঝে।

তনু বলল : আজ এখানকার হাটবার নয় বিশুদা ?

বললুম : দাবা ছাড়া অন্য কিছু জানবার প্রয়োজন হলে মধুকে ধর।

তনুর প্রশ্নটা মধুর কানেও গিয়েছিল। পেয়ালাগুলো নিয়ে যেতে যেতে বলল : এগুলো ধুয়ে রেখে আমি তো হাটেই বেরুচ্চি। বেলা যা হয়েছে, খেতে বসতে আজও দুটো বাজবে।

তনু বলল : হাট দেখতে গেলে মন্দ হত না, কী বল ?

বললুম : আমাকে বুঝি সঙ্গী হতে হবে ?

তনু হেসে ফেলল, বলল : চট করে তৈরি হয়ে নাওনা বিশুদা, আমি এক্ষুণি আসচি।

আমি যে সারাক্ষণ রৈইত থাকি, তনুকে তা জানিয়ে দিলুম।

আমরাও তোমার সঙ্গে যাব মধু, আমাদের ফেলে যেও না। বলতে বলতে তনু বেরিয়ে গেল।

কী একটা জবাব দিল মধু, এ ঘর থেকে তা শোনা গেল না।

দুঃখ করে দেবদ্যুতি বলল : দাবাটা যখন নেই, চলুন আমরাও ওঁদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি।

ডাক্তার আপত্তি করলেন, বললেন : হাট বাজার আমার ভাল লাগে না। তার চেয়ে এই সামনের পাহাড়টায় ওঠা যাক।

দেবদ্যুতি একটু দমে গিয়ে বলল : মিস শোলাপুরকার কোন্ দলে যাবেন ?

একটা হাতহীন কেপ কোটের ভেতর নিজের হাত দুখানা সামলাবার চেষ্টা করতে করতে তনু বাইরে আসছিল, বলল : নিতা আপনাদের সঙ্গে যাবেন। ছেলে-মানুষকে সঙ্গে নিলে আমাদের কাজ কিছু হবে না।

নানিকে নানা উপদেশ দিয়ে মধু পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাইরে বেরিয়েও তনু 'এক সেকেণ্ড' বলে ভেতরে ছুটে গেল এবং পরমুহূর্তেই একটা ছোট জিনিষ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। চেঁচিয়ে বলল : আমরা চললাম তাহলে !

আমরাও বেরুচ্চি।

জবাব দিল দেবদ্যুতি।

নিতার দিকে ফিরে বলল : চট করে তৈরি হয়ে নিন তো মিস শোলাপুরকার।

খানিকটা পথ এগিয়ে তনু বলল : ব্যাগটা তোমার কাছে রাখো বিশুদা, আজ আমার পকেট নেই।

বললুম ঃ এইটে আনবার জন্যেই বুঝি ভেতরে গিয়েছিলে।

তনু বলল ঃ যে যাই বলুক, এ জিনিসের প্রয়োজন কখনো যাবে না।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটল।

ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে তনু বলল ঃ নিতাকে নিয়ে বড়ই ভাবনা হয়েছে আমাদের। শ্বশুর শাশুড়ি তো চিরকালই কাশীবাস করচেন, তাঁদের কাছে কোনও উপদেশ চাওয়াই বৃথা। এদিকে তাঁর ছেলেরও কোন মাথা ব্যথা নেই। বামুনের ঘরে উনিশ বছর তো কম বয়স নয় বিশুদা।

তার গিন্নীপনা দেখে হাসি পেল। এক যুগ আগের মায়েরা মেয়ের বয়স নিয়ে এমনি ভাবনা ভাবতেন। আমি উত্তর দিলুম না দেখে তনু বলল ঃ নির্মাল্য ছেলেটিকে আমাদের সত্যিই ভাল লেগেছিল। অমন বড়লোকের ছেলে, কিন্তু কী চমৎকার ব্যবহার!

একটু থেমে বলল ঃ আমার কী মনে হয় জান বিশুদা? কিছু একটা গলদ এর ভেতর আছে। তা না হলে সে এমন বেঁকে দাঁড়াত না।

বললুম ঃ কল্‌কাতায় এসে মিসেস মুখার্জিরাই বোধ হয় গলদ বাধিয়েছেন।

প্রবলভাবে ঘাড় নাড়ল তনু, বলল ঃ না বিশুদা। ব্যাপারটা যত সোজা ভাবচ তা নয়। তার চেয়ে গভীর কিছু আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

আর কী কারণ থাকতে পারে, আমি ভাবতে লাগলুম।

তনু বলল ঃ নিতা তোমায় কিছু বলেচে কি?

আমাকে : আমি আশ্চর্য হলুম! এ সম্বন্ধে তো কথা হয়নি আমাদের।

এ কথা যেন তনুর বিশ্বাস হল না। তবু চুপ করে রইল।

পেছন থেকে মধু বলল : আমি তাহলে বাজারটা চট করে সেরে নিই বৌদিদিমণি।

গল্পে গল্পে কখন যে আমরা হাটের ভেতর পৌঁছে গেছি খেয়াল করিনি। চারিদিকের পাকা বাড়িগুলোর মাঝখানে বিরাট বাঁধানো উঠোনটি আজ বিচিত্র লোক সমাগমে গম গম করছে। চাকের কাছে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো একটা একটানা গম্ভীর ধ্বনি উঠছে। নিজে ভেতরে না গেলে এই কোলাহল থেকে কোন বিশেষ শব্দকে বিচ্ছিন্নভাবে শোনবার উপায় নেই।

তনু বলল : চল না আমরাও তোমার বাজার করা দেখি।

বলে আমরা সবাই এগিয়ে গেলুম।

তনু হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠল : কী চমৎকার কড়াইশুঁটি দেখ বিশুদা! ওরে সের কত করে?

বছর সতর আঠারোর একটি পাহাড়ী মেয়ে একটা উঁচু কাঠের বাক্সের ওপর বসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক পাহাড়ী যুবকের সঙ্গে কথা কইছিল। রঙে ছুপিয়েছে নিজের গাল দুটো, আর চুলে গুঁজেছে গোটাকয়েক জংলী ফুল। অবজ্ঞার সুরে বলল : ছ আনা।

মধু ধমকে উঠল, মুখ ভেঙিয়ে বলল : হ্যাঁ, ছ' আনা দিচ্চি আর কি। এসে অবধি চার আনার বেশি দাম দিয়েচি কখনো!

মেয়েটি দ্বিতীয়বার আর মুখ ফেরাল না। যেমন কথা কইছিল, তেমনি কইতে লাগল।

এগিয়ে গিয়ে মধু ডাকল : এইদিকে আসুন বৌদিদিমণি, অমন কড়াইশুঁটি আজ চোদ্দ পয়সাতেই পাওয়া যাবে।

আমরা এগিয়ে যেতেই আস্তে আস্তে বলল : একটা কথা আপনাকে গোড়াতেই বলে রাখি। ভাল জিনিষ দেখে কখনো ভাল বলবেন না। একেই তো আপনাদের দেখলে দাম হেঁকে বসে, তার ওপর পছন্দ হয়েছে টের পেলে এরা আর ছেড়ে কথা কইবে না। অন্তত দুটো পয়সা ঠকিয়ে নেবেই।

কথাটা মেনে নিল তনু, বলল : ঠিকই বলেচ তুমি।

সামনের একটা দোকানে বড় বড় স্কোয়াশ সাজানো আছে, কিন্তু দোকানী নেই। তনু বলল : এ দোকানের লোক কোথায় গেল মধু ?

মধু বলল : বোধ হয় কারু বাড়ী নানির কাজ করে। দোকান সাজিয়ে দিয়ে তাই কাজ করতে গেছে।

তনু আশ্চর্য হয়ে বলল : তবে এর জিনিষ বেচবে কে ?

মধু বলল : কেন এই তো ভাগ দিয়ে গেছে। একটি আনি ফেলে দিয়ে এক ভাগ তুলে নিতে হবে। সন্ধ্যেবেলা মেয়েটা এসে পয়সাগুলো গুটিয়ে নেবে, চটখানা ঝেড়ে ঝুড়ে কাঁধে ফেলে বাড়ি ফিরবে সাত দিনের চা কিনে।

এমন অদ্ভুত কথা তনু কখন শোনেনি, বলল : ভারি মজার তো।

প্রচুর জিনিষপত্র কিনে মধুকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েও তনু বাজারে ঘুরতে লাগল। বলল : বেশ লাগে ঘুরে ঘুরে বাজার করতে। নিজের দেশে তো এমন সুযোগ আমরা পাইনে। সেখানে কত বাধা, কত সঙ্কোচ। নিজেদের সমাজটাই একটা শ্বশুর বাড়ি।

সারাক্ষণ শাশুড়ী ননদের ভয়। কে কী দেখবে, আর কে কী বলবে, তাই ভেবেই আমরা আড়ষ্ট হয়ে আছি।

আমি কথা কইলুম না।

তনু বলল: এখানে কতো সহজ মনে হচ্ছে সব। তোমার সঙ্গে একা বেরিয়ে আসতেও কোন সঙ্কোচ হল না, ফেরার জন্যে ভাবনাও হচ্ছে না কোন।

সত্যিই আমরা অনেক দেরী করে ফিরলুম। সূর্য তখন মাথার ওপরে উঠেছে, আর পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছে দেহ।

বাইরের রাস্তায় জোরে জোরে পায়চারি করছিল দেবদ্যুতি। আমাকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, বলল: শিগগির আয় হতভাগা! অত্যন্ত জরুরী খবর আছে।

নিজেও এগিয়ে এল খানিকটা।

বলল: এই দেখ তোর চিঠি এসেছে তোর সেই রঞ্জনলালের চিঠি।

হাত বাড়িয়ে বললুম: আমার চিঠি তোরা খুললি কেন?

তোর চিঠি বলেই তো খুললুম।

দেবদ্যুতি জবাব দিল।

এই তোর ইন্টারভিউএর চিঠি, পরশু মঙ্গলবার বেলা দশটায় হাজির হতে হবে। আর এই রঞ্জনলালের চিঠি। পত্রপাঠ রওনা হয়ে আসবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে।

বিস্ময়ে অভিভূত হল তনু। তার মুখের দিকে চেয়ে দেবদ্যুতি বলল: বিশ্বাস হচ্ছে না তনুদি? ভেতরে এসে দেখুন, মিস শোলাপুরকার আর আমি ওর সব কিছু গুছিয়ে রেখেছি, ওর খাবারও তৈরি হয়ে গেছে।

আপনিই বলুন: দেবদ্যুতি বলে চলল: এখন ওর একটা চাকরি করা উচিত নয় কি? রঞ্জনবাবু যা লিখছেন, তা যদি সত্যি হয় তো এবারের চাকরিটা ওর নিশ্চই হবে। বিশ্বপতির মতো সোনার মেডেল পাওয়া উমেদার এবারে নেই, অথচ সরকারের লোক চাই জন চারেক।

দেবদ্যুতি হেসে বলল: পুনশ্চ দিয়ে ভদ্রলোক লিখেছেন যে গোঁয়াতুর্মি করে যদি এ না যায়, তো আজ পর্যন্ত নানা কাজে তাঁর যা খরচ হয়েছে, তার একটা বিল পাঠাবেন ফেরৎ ডাকে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তনু খুসিই হল।

বারান্দা থেকে নিতা বলল: আপনার ঐ খদ্দরের পাঞ্জাবী পরেই দেখাটা সারবেন নাকি?

হেসে বললুম: তা নয় তো বকের পাখা পাচ্ছি কোথায়?

ডাক্তার শোলাপুরকার বললেন: ওরও একটা দাম আছে বিশুবাবু, সময় বিশেষে ঐ বকের পাখাও অনেক কাজ দেয়।

আমরা তখন ঘরে এসে ঢুকেছি। ব্যস্তভাবে দেবদ্যুতি বলল: তোকে একটা খবর দেয়া হয়নি। মিস শোলাপুরকার তোর সর্বনাশ করেচেন।

বললুম: আমার আবার আছে কী যে সব নাশ করবে?

দেবদ্যুতি বলল: যা আছে, বাক্স গোছাতে সে সব দেখে নিয়েছেন। রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো তোর বাবা মার ছবি, সোনার চেনওলা পুরনো ট্যাঁক ঘড়ি আর সোনা রূপোর কাজ করা একটা ফর্সির নল।

শুদ্ধ করে বলল ঃ নল নয়, নলের মুখটা।

পাশে দাঁড়িয়ে নিতা বলল ঃ আর লাল সালুতে মোড়া কাঠের খড়ম এক জোড়া।

বললুম ঃ উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ সম্পত্তি পেয়েছি।

দেবদ্যুতি বলল ঃ একটা জিনিষেরও আমরা অসম্মান করিনি। কপালে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে মিস শোলাপুরকার সব জিনিষই আবার সাজিয়ে রেখেচেন।

নিতা টেবিল ঝেড়ে খবরের কাগজ পেতে দিল। মধুর হাতে এল একজনের খাবার। ডাক্তার বললেন ঃ বসে পড়ুন বিশুবাবু, গাড়ির আর বেশি দেরী নেই। আপনাকে তুলে দিয়ে এসে আমরা খেতে বসব।

তনু বলল ঃ কেন, বাসে গেলে তো ঘণ্টা তিনেক সময় পাওয়া যেত!

দেবদ্যুতি বলল ঃ মিস শোলাপুরকার সে যুক্তি বাতিল করে দিয়েচেন। মোটর বাস কোনো জায়গায় আটকে পড়া বিচিত্র নয়, কিন্তু বড় রকমের কোনো ল্যাণ্ড স্লিপ ট্লিপ না হলে ট্রেন কোথাও থেমে থাকবে না। কাজেই রিস্ক যাতে একেবারেই নেই, সেই রকম যানে যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত।

দেখলুম, আমার কোন মতামত না নিয়েই আমাকে তাড়াবার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। দেবদ্যুতি বলল ঃ তুই খেতে বস বিশু, আমি তোর টিকিটটা কেটে আনছি।

বললুম ঃ অনর্থক বেশি পয়সা খরচ করিসনে যেন।

বেরিয়ে যেতে যেতে দেবদ্যুতি বলল ঃ সে ভাবনা আমাকে ভাবতে দে।

উপায় নেই। যথা সময়ে ষ্টেশনে যাত্রা করতে হল। তনু ও ডাক্তার সঙ্গে এলেন। নিতা বলল: তোমরা যাও বৌদি, আমি এখানে দাঁড়িয়েই ওঁর যাওয়া দেখব।

তাকে টেনে নিয়ে যাবার উৎসাহ ছিল না কারও। মধু এগিয়ে গিয়ে তাড়া দিচ্ছিল। তনু বলল: দুর্গা দুগা।

ষ্টেশনে কোলাহল তখন প্রায় থেমে এসেছে। যাত্রীরা যাঁরা যাবার তারা গাড়িতে চেপে বসেছেন। যাঁরা থাকবার তাঁরা নীচে দাঁড়িয়ে ট্রেন ছাড়ার প্রতীক্ষা করছেন। দেবদ্যুতি ঠেলে একটা ফার্ষ্ট ক্লাস কামরায় আমাকে তুলে দিল। বলল: টিকিটটা রিটার্ণ কিন্তু, কাজ শেষ হলেই আবার ফিরে আসিস।

গাড়ি ছেড়ে দিল, কোন উত্তর দিলুম না। প্ল্যাটফর্মের ওপর চলতে চলতে আবার বলল: না এলে তোকে আনবার জন্যে আমাকেই আবার ছুটতে হবে।

তনু তার ছোট রুমালটা নেড়ে বলল: সত্যি সত্যিই এস কিন্তু বিশুদা!

ট্রেন অনেকটা এগিয়ে গেল। আমাদের বাঁকটার কাছে একজন বৃদ্ধার সঙ্গে আমাদের বাড়িওলার ছোটবাবুকে দেখতে পেলুম। হাত নেড়ে হৈ হৈ করে ট্রেন থামালেন। এঁরা নাকি এমনি করে ট্রেন থামিয়েই আজ তিন পুরুষ ওঠানামা করছেন। জিজ্ঞেস করলে বলেন, যে এটুকুও যদি না পারি তো সাত পুরুষ এদেশে আছি কেন!

বাইরের রেলিং ধরে নিতা দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন থামতে দেখে ছুটে এগিয়ে এল। জানালা ধরে বলল: একটা কথা আপনাকে

বলার অবসর পাইনি। নির্মাল্যবাবুকে সবাই আজকাল বড় হীন ভাবচেন। আপনি তাঁকে তাই ভাববেন না।

কোন উত্তর দিলুম না।

খানিকটা আগে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বৃদ্ধাকে তুলে দিতেই গাড়ী আবার চলতে শুরু করল। মিতা কী একটা লুকোবার জন্য মুখ ফিরিয়ে নিল।

আমাকে দেখতে পেয়েই ছোটবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন: হঠাৎ চলে যাচ্চেন যে বিশ্বপতি-বাবু?

বললুম: এরা সব যুক্তি করে তাড়িয়ে দিলে।

আবার ফিরবেন তো?

বললুম: ঠিক বলতে পারিনে।

বাঁকের পেছনে গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে আবার যখন তাদের দেখতে পেলুম তখন আর কাউকে চেনা যাচ্ছে না। মনে হল মিতা তেমনি ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শেয়ালদয় গাড়ি থামতে 'এই যে' বলে ভীড় ঠেলে যে ভদ্রলোক এগিয়ে এল সেই আমাদের রঞ্জনলাল। স্যুটকেস আর বিছানাটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে নিতে বলল: এসে পড়েচ তাহলে! আমি ভেবেছিলুম, বুঝিবা জমেই গেছ।

গতানুগতিক ভাষায় সৌজন্য প্রকাশ তার রীতি নয়। তাই আলাপ অল্পেই সহজ হয়ে আসে। বললুম: জমতে দিলে কই?

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে রঞ্জন একটা গাড়ি নেবার মতলব আঁটছিল। বাধা দিয়ে বললুম: ব্যবসায়ে লাভ হচ্ছে বুঝি খুব যে এইটুকু পথ যেতে হাতি ঘোড়া পাল্কী বেহারা দরকার!

করুণ ভাবে রঞ্জন বলল: তাহলে একটা কুলিই নিই?

সে পয়সা আমায় দিও।

বলে জিনিষ দুটো আমি কেড়ে নিলুম!

রঞ্জন ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকেই হেসে ফেলল, বলল: তাই চল। রাস্তায় হাত বদল করা যাবে।

মেসে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। দেবেশবাবুর 'এক কল জল' খাওয়া তখন সাঙ্গ হয়ে গেছে। সবাই তখনও মেসে ফেরেননি। অফিস ফেরত বাণীকণ্ঠ তখন কলতলায় দাঁড়িয়ে গুন-

গুন করে দাঁতের ওপর বুরুশ চালাচ্ছিল। তার শাদা দাঁতের গর্ব আছে। বুরুশ মুখেই অভিবাদন করল, বলল : নমস্কার বিশ্বপতি-বাবু। কবে এলেন ?

সুটকেস আর বিছানা হাতেই ছিল। কাজেই এসব প্রশ্ন যে উত্তর আশা করে না, তা বোঝা যায়। সংক্ষেপে বললুম : আজ।

কলের নিচে একজন পশ্চিমা চাকর সকালের উচ্ছিষ্ট বাসন মাজছিল। ছাই সুদ্ধ হাতখানার ওপরের অংশ দিয়ে কপালের দুগাছা চুল সরিয়ে একবার পেছন ফিরে দেখল। লোকটি নতুন, ব্যস্ত হবার মত কিছু না দেখে নিজের কাজেই আবার মন দিল।

রঞ্জন তার নিজের ঘরেই আমার স্থান দিল। বলল : ঘর তো আর খালি নেই, একটাতেই দুজনে থাকা যাবে, কী বল !

আমি কী একটা বলতে যাচ্ছিলুম। রঞ্জন আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল : দাঁড়াও কাজের কথার আগে তোমায় এক পট চা খাওয়াই। মাখন আর বড় রুটিও কিনে রেখেচি একখানা।

লজ্জা বোধ করে বললুম : এসব আবার কেন ?

রঞ্জন তখন জল আনতে বেরিয়ে গেছে।

চায়ে চুমুক দিয়েই একটা প্রশ্ন করে ফেললুম অভদ্রের মতো। বললুম : আচ্ছা রঞ্জন, আমাকে গোলামিতে বহাল করতে তোমার এমন আগ্রহ কেন বলতো ?

কথাটায় রঞ্জন আঘাত পেল কিনা জানি না, জবাব দিল হেসে, বলল : নিজের স্বার্থে।

অর্থটা ধরতে না পেরে বললুম : তার মানে ?

রঞ্জন হেসে বলল : মানে তো সহজ। তোমার একটা

চাকরি জুটলে আগেকার মতন আমার চায়ের খরচটা বাঁচবে। আর সেটা যখন বন্ধ হবে, তখন আমার সিঁদুর আলতার খদ্দের প্রথম দফায় একটি এবং তাঁকে মুরুব্বি ধরে আরও দশটি বাড়াবার ভরসা রাখি। বলেই হাসতে লাগল।

এই প্রকৃতির লোকদের পছন্দ না করে উপায় নেই। খুনোখুনি দেখলে এরা চোখ বুঁজে থাকে, নয় পিছন ফিরে বলে, কৈ, দেখতে পাচ্ছি না তো কিছু! জীবনের গ্লানিটুকু বাদ দিয়ে তার অবিমিশ্র আনন্দটুকুই যারা অপরের মুখের সামনে তুলে ধরতে পারে, সুখী তো তারাই! আর সত্যকার শিল্পীও তারা। রঞ্জন আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল, তবু তার উত্তরটাও ভাল লাগল। হাল্কা ভাবে বললুম: খোঁজে আছে নাকি কেউ?

রঞ্জন বলল: ঘটক বিদায় আগাম নিয়ে বসে আছি যে!

দুজনেই হাসলুম।

যথা সময়ে সাক্ষাতাদি হল। রঞ্জনের কথাই ঠিক দেখলুম। স্বাস্থ্যের এমন অভাব আগে কখনো লক্ষ্য করিনি। প্রাণশক্তির সবটুকুই যদি বিদ্যার্জনের সময় নিঃশেষ হয়ে গেল, তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি সারাজীবন একখানা কঙ্কাল বহন করে বেড়ানো! আলোর জন্য প্রদীপ আনা হল, তেল ঢালা হল কিন্তু প্রদীপ জ্বালাবার সময় দেখা গেল যে আগুন নেই। যত্ন করে যে আগুন কিছুক্ষণ জিইয়ে রাখা হয়েছিল, অনেকক্ষণ আগেই তা নিবে গেছে। আমাদের শিক্ষাও আজ নিবে যাবার শিক্ষা, আগুন জ্বালার শিক্ষার অভাবে আমরা ডুবে যাচ্ছি।

রঞ্জনের বিশ্বাস ছিল না আমার ওপর। তাই নিজে উপস্থিত থেকে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল। ফেরার পথে

মন্তব্য করল ঃ তোমার এ চাকরি যদি না হয় বিশ্বপতি, তবে বুঝবে, যে চাকরির বাজারে যোগ্যতার দরকার নেই।

বললুম ঃ যোগ্যতার বিচারটা ওজন নয় যে সকলের কাছেই এক হবে। তুমি যাকে যোগ্য বলে মনে করচ সে যে আরেকজনের বিচারে অযোগ্য মনে হবে না, জোর করে তা বলতে পার না।

রঞ্জন বলল ঃ তর্কে কোনদিনই তোমার সঙ্গে পারিনি, আজও পারব না। কিন্তু সত্যি করে বলতো, তুমি নিজেও কি এ কথা বিশ্বাস কর না?

এ কথার উত্তর নেই।

বেলা তখনও অনেক বাকি ছিল। এসপ্ল্যানেডে শ্যামবাজার ট্রাম না ধরে রঞ্জন আমায় কার্জন পার্কে টেনে আনল। বলল ঃ ঘরের টান তো কারুরই নেই। এসো এই কোণটায় একটু বসা যাক।

নরনারীর বিচিত্র মেলা তখনও শুরু হয়নি। শুধু দুএকজন লোক ইতস্তত ছড়িয়ে আছেন। আমরাও বসলুম।

ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রঞ্জন বলল ঃ জীবনে এত আবর্ত আছে কে জানত!

সেই চিরন্তন আক্ষেপ! যে সত্য ভুলতে পারলে জীবনটা মধুর হত, বিশ্রামের প্রথম মুহূর্তেই কে যেন তা চোখের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু কই, রঞ্জনকে এ সব তো আগে ভাবতে দেখিনি।

হেসে বললুম ঃ আবর্ত আছে বলেই তো সোনালি রোদ তার ওপর চিকচিক করে।

রঞ্জন উত্তর দিল না। মনে হল, ভাবনার ভেতর সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে যেন।

এক সময় একখানা গাড়ি থামবার শব্দ পেলুম। সামনের সীট থেকে নিমীলা নেমে এল, বলল : বিশ্বপতিবাবু না?

নির্মাল্য গাড়ি চালাচ্ছিল, সে নামল না।

আমার উত্তর না পেয়েও আবার প্রশ্ন করল : একাই ফিরলেন তো?

এ প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর হত যে দেবদ্যুতিকে সুস্থ রেখে এসেছি। কিন্তু কী মনে করে উত্তর দিলুম : হ্যাঁ।

নিমীলা চমকে উঠল না, আশ্চর্যও হল না এতটুকু, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : আমরা সেই আশাই করছিলুম।

কেন জানি না, আজ তার ভুল ভেঙে দেবার ইচ্ছা হল না।

রঞ্জন আমার সঙ্গেই উঠে এসেছিল। নিমীলার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলুম : নিমীলা তনুদের আত্মীয়, আর রঞ্জন আমার বন্ধু।

নির্মাল্য তার গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিয়েছিল। নিলীমা বলল, আসুন না, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

আমার মুখের দিকে চেয়ে রঞ্জন রাজী হয়ে গেল। আমরা পেছনে বসলুম, নিলীমা বসল সামনে নির্মাল্যের পাশে।

খানিকটা এগিয়ে নিমীলা বলল : আমাদের বাড়ি যেতে রঞ্জনবাবুর আপত্তি হবে?

আপত্তি কিসের?

রঞ্জন উত্তর দিল।

আমাদের যাবার জায়গা নেই বলেই তো পার্কে এসে বসেছিলুম।

বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল নির্মাল্যকে। গাড়িতে সে একটা কথাও কইল না। নিমীলাকে সে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়েই চলে গেল। আমরাও নামলুম।

আমাদের বসবার ঘরে বসিয়ে নিমীলা তার মাকে ডাকতে গেল। পাশের ঘরে তাঁর গলার স্বর আমরা শুনতে পাচ্ছিলুম। বোধ হয় কোন আনাড়িকে দিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলেন।—

গেল তো এখানটা ? পারিনে বাবা। মেড়োর দেশ থেকে ধরে এনেছি, কতদিন যে লাগবে মানুষ করতে তা ভগবান জানেন। ইত্যাদি।

একটু বাদেই কলরব শোনা গেল।— দেখছিস মিলু, তোর এই ব্রোকেডের জামাটা! ঘাড়ের কাছটা একেবারে জ্বালিয়ে দিলে। এত করে বললুম ভূতটাকে যে বেশি গরম করিসনে, লক্ষ্মীছাড়া শুনবে কেন!

মেয়ের শোক প্রকাশটা শোনা গেল না, তবে বিচারের রায় শোনা গেল।— দিও ওর এক মাসের মাইনে কেটে, তাহলে যদি শিক্ষা হয়।

এর পরের কথাগুলি অস্পষ্ট। বোঝা গেল না। তবে স্পষ্ট হল অল্পক্ষণ পরেই, যখন তাঁরা ঘরে এলেন।

মাসিমা বললেন ঃ সত্যি দেবদ্যুতি যে এতো শিগগির—

রঞ্জন চুপ করে থাকতে পারল না। বাধা দিয়ে বলল ঃ আপনারা ভুল করছেন। মিষ্টার ব্যানার্জি এখন দার্জিলিঙে আছেন এবং ভালই আছেন।

মা মেয়ে দু জনেই এক সঙ্গে চমকে উঠলেন। কিন্তু জবাবও দিলেন তখুনি।

আমরাও তাই ভাবছিলুম, অবস্থা তো তার এমন কিছু খারাপ ছিল না।

নিমীলা তখন তৎপরভাবে তার শাড়ীর আঁচলের একটা কোণা আঙুলে জড়াচ্ছিল, আত্মস্থভাবে বলল ঃ ভালই আছেন তাহলে।

রঞ্জন বলল ঃ ভালই আছেন। মাস খানেক পরে হয়তো এখানে ফিরবেন।

এরপর আর গল্প জমল না।

কলকাতার কাজ চুকে গেল, কিন্তু দার্জিলিঙ ফিরে যেতে আর মন উঠল না। বুকের ভেতর কোথায় একটা খোঁচা নিয়ে ফিরেছি, বিশ্রামের সময় তা খচ খচ করে বেঁধে। যুক্তি দিয়ে তার উৎস খুঁজে পাইনে, হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করি।

রঞ্জন আমায় ছেড়ে দিতে চাইল না। বলল: কী হবে সেখানে গিয়ে। তার চেয়ে যতদিন চাকরি না হচ্চে, ততদিন আমায় একটু সাহায্য কর।

দেবদ্যুতির জন্যে আর ভাবনা নেই। তাকে দেখবার অনেক লোক হয়েছে। বললুম: সেই ভাল।

মাঝে মাঝে বিরক্ত হয় রঞ্জন। বলে: হতভাগারা সব চুপ মেরে গেল।

এ রকম উক্তি যে উত্তরের আশা করে নয়, তা বুঝি। সিঁদুরের প্যাকেট মুড়তে মুড়তে তবু প্রশ্ন করি: কাদের কথা বলচ?

রঞ্জন চটে ওঠে, বলে: তোমার ঐ চাকরি দেবার মালিকদের কথা।

তার রাগ দেখে আমি হাসি, বলি: তুমি কি এখনও কোন আশা রাখ নাকি?

সেদিন এমনি একটা কথার ওপর রঞ্জন ফেটে পড়ল! বলল: তুমি কী ভাব নিজেকে বলতো? তোমার কিসের অহংকার?

বললুম: অহংকার কিসে দেখলে?

এই যে নিস্পৃহ থেকে জীবনকে উপেক্ষার ভান করছ, এ তোমার অহংকার নয়? মনের সহজ গতির মুখে পাথর চাপা দেওয়াকে তুমি পৌরুষ বল?

বড় কড়া শোনাচ্ছিল তার কথাগুলো। আমি জবাব দেবার চেষ্টা করলুম না।

উত্তেজিত ভাবে পাথরের নোড়াটা ঠক করে টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল: তুমি একটা কাপুরুষ। একটা কচি মেয়ের যে সাহস আছে, তোমার তা নেই। পাছে দায়িত্ব ঘাড়ে আসে, সেই ভয়ে নিজের মনকে অস্বীকার কর।

ব্রেভো!

পেছনে হাত তালির সঙ্গে দেবদ্যুতির গলার স্বর শুনে দুজনেই চমকে চাইলুম। দেবদ্যুতিকে এগিয়ে দিয়েছে নিতা ও তনু।

আমাদের দেখতে পেয়ে কী হাসি তাদের। ফুলে ফুলে তারা হাসতে লাগল। আমার দিকে চেয়ে রঞ্জনও এবারে হেসে ফেলল। বলল: যাও আয়নায় একবার দেখে নাও শ্রীমুখখানি, নিজেও আনন্দ পাবে।

আয়নার অভাব আমাদের নেই। ফ্রেমহীন টুকরো কাচ আছে। তাতেই নিজের মুখ দেখলুম। হাসবারই কথা, আমিও যোগ দিলুম তাদের হাসিতে।

বুকে সাদা অ্যাপ্রন বেঁধে আমরা কাজ করি। অনেক দিনের অভ্যাস বলে রঞ্জনের এই ন্যাকড়াখানা তত বিচিত্র হয় না। কিন্তু আমার নতুন চেষ্টা তাই পা থেকে মুখ পর্যন্ত কুমকুমে একেবারে

রঞ্জিত। অন্যমনস্ক ভাবে কখন এক সময় গাল ও গলা চুলকেছি, বোধ হয় দাড়ির সুড়সুড়িতে। সিঁদুরে চিত্রিত হয়ে গেছে সারা মুখখানা।

দেবদ্যুতি এবারে হাত জোড় করে রঞ্জনকে নমস্কার করল। বলল: নিজের এই পরিচয়টা তাহলে নিজেই দিই। আমি লক্ষ্মীছাড়ার বাল্য বন্ধু দেবদ্যুতি ব্যানার্জি।

নমস্কার ফিরিয়ে রঞ্জন বলল: আমার বিজ্ঞাপন অবশ্য আমার গায়েই আছে। কিন্তু কী করে এই অভাগাকে চিনলেন, সেই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি।

উত্তরে দেবদ্যুতি শুধু একটু হাসল।

নিতারা কখন নমস্কার বিনিময় করেছে টের পাইনি। তনু বলল: তোমাদের ফ্যাক্টরি কখন বন্ধ হয় বিশুদা?

বললুম: সন্ধ্যে ছটায়।

ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল: এখনও তাহলে দেড় ঘণ্টা বাকি?

রঞ্জন বলল: আজ তো আমাদের শনিবার বিশ্বপতি। চারটেয় ছুটি। যেমন তুমি, তোমার সঙ্গে আমিও আধ ঘণ্টা বেশী কাজ করে ফেলেছি।

আমার দিকে ফিরে বলল: ওঠাও সব তাড়াতাড়ি!

নিতা হেসে বলল: আজ তো বিস্যুৎবার রঞ্জনবাবু!

গম্ভীর ভাবে রঞ্জন বলল: আমরা কি বারেরও গোলাম নাকি? বার বদল হবে আমাদের ইচ্ছেয়।

তনু একটু এগিয়ে এসেছিল, বলল: দেখি তো আপনাদের সিঁদুরটা।

রঞ্জন যেন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ল। ব্যস্তভাবে দেরাজ খুলে কিছু শিশি ও কৌটো বার করল টেবিলের ওপর। বলল: দিনে দিনে আমরা যেন বন্য হয়ে যাচ্ছি।

আমার দিকে ফিরে বলল: এগুলো বেঁধে ফেলোতো এই খবরের কাগজ দিয়ে। আমিই তুলছি ওসব জিনিষপত্র।

সিঁদুর পরীক্ষা করে তনু বলল: ভারি সুন্দর রঙ আপনার সিঁদুরের।

গর্বিত ভাবে রঞ্জন বলল: আলতাটাও বাজারের চেয়ে খারাপ নয়। অন্য সব জিনিষ একবার দেখে না হয় বিলিয়ে দেবেন।

তনু আশ্চর্য হয়ে বলল: ও সব কি আমার জন্যে দিচ্চেন?

রঞ্জন বলল: আপনাকে বইতে হবে না, আমিই গাড়িতে তুলে দিয়ে আসব।

তনু সঙ্কোচ করতে লাগল: অত জিনিষ—

হাতজোড় করে রঞ্জন বলল: মাপ করবেন, ভদ্রলোক আমরা দুজনের একজনও নই। আপনার ভদ্রতার ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারব না।

দেবদ্যুতি হাসতে লাগল।

রঞ্জন বলল: তোমার ষ্টোভটা ধরালে কেমন হত বিশ্বপতি?

গম্ভীর ভাবে বললুম ঃ  সেটা আরেক দিন হবে।

আজ নয় কেন ?

রঞ্জন তার প্রশ্ন তুলে ধরল আমার মুখের ওপর।

বললুম ঃ  তাহলে বাজারে যেতে হবে স্পিরিট আনতে।

সবাই হেসে উঠলেন একসঙ্গে।

ক্ষুণ্ণভাবে রঞ্জন বলল ঃ  অভ্যাগতদের তাহলে—

তনু বলল ঃ  কাপড় বদলে গাড়িতে এসে বসুন না, ওই বড় নামটা তাহলে আপনাদেরই ফিরিয়ে দেব।

আমি বললুম ঃ  প্রস্তাবটা মন্দ নয়। একটু দাঁড়াও আমরা তৈরি হয়ে নিচ্চি।

রঞ্জন বলল ঃ  হ্যাঁ তা দাঁড়িয়েই থাকুন। তিন জনকে বসতে দেবার জায়গা তো আমাদের নেই !

আমাদের অনুমতির অপেক্ষা করেনি দেবদ্যুতি, তক্তপোষের ওপর সে আগেই বসে পড়েছিল। তনু বসল আমাদের একমাত্র চেয়ারখানায়। আর নিতা ঘুরে ঘুরে আমাদের সরঞ্জাম দেখতে লাগল।

মুখ হাত ধুয়ে ঘরে ঢুকতেই নিতা বলল :  আপনার কোন ঘর ?

বললুম:  আমি কি মেয়ে যে আমার একখানা আলাদা ঘরের দরকার ?

তোয়ালে দিয়ে রঞ্জন তার ঘাড়ের ময়লা তুলছিল। বলল ঃ মনের মিল থাকলে তেঁতুল পাতায় যদি দুজনে শোয়া যায় তো এত বড় একখানা ঘরে দুটো লক্ষ্মীছাড়া থাকতে পারবে না !

উপভোগ করে নিতা বলল ঃ  খুব পয়সা বাঁচাচ্ছেন তো !

চিঠিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তনু বলল : কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলেই এখন চলবে।

একখানা চিঠি কুড়িয়ে নিয়ে নিতা তার এপিঠ ওপিঠ উল্টে দেখল। তারপর নামিয়ে রাখবার সময় অবজ্ঞার সুরে বলল : পাঁশুা লিখেছে।

ডাক্তার বললেন : কিন্তু আমার পেশা যে গেল।

তনু বলল : গেলে তো বাঁচতাম! কিন্তু যায় কই?

রঞ্জন বলল : ও ব্যবসা তো সহজে যাবার নয় ডাক্তার সাহেব। স্বাধীন ভারতে রাজার রাজ্য যাবে, বণিকের বাণিজ্য, চাকুরের চাকরিও হয়তো যাবে। কিন্তু আমাদের পেটের পীলে তো যাবে না। কাজেই আপনারা যেতে চাইলেই বা যেতে দেবে কে? স্বাধীন ভারতে আপনারা অমর হবেন।

আমি যোগ করে দিলুম : আর হবে আমাদের সিঁদুরের ব্যবসা।

এক সঙ্গে সবাই হেসে উঠলেন।

হাসতে হাসতে তনু বলল : খুব মানি এ কথা।

দেবদ্যুতি নিতাকে বলল : একটু চা হবে না ছোটদি!

এ সম্বোধনটা আগে শুনিনি, চুক্তিটা বোধ হয় আমার চলে আসবার পর হয়েছে। আরও একটু আন্তরিকতা দেখলুম ছোটদির উত্তরে : বলল : বড্ড বেশি চা খাচ্চেন আজকাল।

অভিভাবকের কথায় দেবদ্যুতি তার জিভ কেটে চুপ হয়ে গেল।

আমি বললুম : ও যখন যেটা করে, একটু বেশিই করে।

দেবদ্যুতি ধমকে উঠল। বলল : তুই আর কথা বলিসনে।

একটা অপদার্থ কাপুরুষ। অত বড় দেহটার মধ্যে যদি এতটুকু সাহসও থাকত, তো এতদিনে মানুষ হতে পারতিস।

সেই এক অভিযোগ! আমার অপরাধ জানি না। তবু বললুম: মানুষ হতে গেলে আরও অনেক কিছু লাগে ভাই, শুধু মনুষ্যত্ব নয়।

তৎপর ভাবে নিতা বলল: বলুন টাকা!

হেসে বললুম: সেটাও চাই। আমাদের দেশে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের টাকা ছাড়া আর কিছুই নেই। আমরা তবু তাদের দুবেলা পূজো করচি তেত্রিশ কোটির একজন বলে।

আমার কথার উত্তর দিল না দেবদ্যুতি। বলল: আপনি ঠিকই বলেন রঞ্জনবাবু। ওর ঐ গড়ের মাঠখানায় যদি দায়িত্ব নেবার এতটুকু শক্তি থাকত তো ওকে আমি কাপুরুষ বলতুম না।

বলে আমার কাঁধটা দেখিয়ে দিল।

তনু বলল: সাহসের অভাব আবার কোথায় দেখলেন আপনারা?

দেবদ্যুতি বলল: আপনারা হয়তো তাই ভাবলেন। কিন্তু যে পুরুষ শক্তিকে আগলে রাখল যক্ষের মত, বাড়াল তবু খরচ করল না, তাকে কাপুরুষ ছাড়া আর কী বলব? এই সব ভীরু সন্ন্যাসীরা নতুনকে ভয় পায়। শঙ্কার চোখে দেখে সৃষ্টিকে। আর নীড় বাঁধবার ডাক পড়লে পিছিয়ে যায় পঞ্চাশ পা।

ডাক্তার শোলাপুরকার এতক্ষণ শুধু রসোপভোগ করছিলেন। এবারে হঠাৎ একটা জর্মন বুলি তাঁর মনে পড়ে গেল। কারও বোধগম্য হল না দেখে প্রথমে তাঁর তর্জমা করলেন ইংরেজীতে পার বাঙলায়। বললেন: Defeatism—পরাজয়ের মনোভাব। যাদের বিপ্লব ভীরু মন, তারাই চায় শান্তি ও গতানুগতিকতা। একালের কুমারেরা যেমন দায়িত্বহীনতা গোপন করে পৌরুষের নামে।

তনু হাসছিল, বলল : বিশুদার বিয়ে না দিয়ে তোমরা ছাড়বে না দেখছি।

মুখের কথা লুফে নিয়ে দেবত্যুতি বলল : সত্যি বৌদি, বিয়ে না করার ভেতরেও হতভাগা যে কী মাহাত্ম্য দেখে শুধু ওই জানে।

সকলের দৃষ্টি পড়েছে আমার ওপর, তাই আর চুপ করে থাকা চলে না। সমগ্র ভাবে একটা সমালোচনা করলুম : বিয়ে বলতে তোমরা যা বোঝ, তা কারুরই হয় না। স্বপন ও সমর্থন, যাকে বিয়ের শ্লোকে মিষ্টি করে বলা হয়েচে 'যদস্তু হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব', এই হচ্চে প্রেমের গোড়ার কথা। কিন্তু আজকের সমাজে কোথাও তা দেখবে না। এখন অভিসার চলেছে আত্ম গোপনের পথে। মনের মিল তো মাথার মিল নয়, নয় দেহের মিল। এ মিল অনুভূতির, মিল প্রকৃতির। এর বেশি খুলে বলতে হলে সভ্যতার গণ্ডি এড়াতে হবে। অত সাহস আমি পাব কোথায় ! আমি তো বিপ্লবী নই !

প্রেম হীন বিয়ে ও বর্ণশঙ্করতা নিয়ে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলেও প্রবৃত্তি হল না। দেবত্যুতিও আর কিছু বলতে দিল না, বলল : ভাল করে বাঁচবার চেষ্টা যদি তোর থাকত, তাহলে ভাগ্যের হাতে এমন করে আত্ম সমর্পণ করতিস না !

পরিহাসটা যাতে বেশ ভাল করে উপভোগ করতে পারা যায়, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে নিতা বলল : ঘাবড়াবেন না বিশুবাবু, আমি চা আনতে যাচ্চি।

নিতা বেরিয়ে যাচ্ছিল, ডেকে বললুম, একটু তাড়াতাড়ি পাঠিও নিতা, গোঁয়ারটার সঙ্গে গালাগালিতে আজ পেরে উঠচি না।

তোকে আমি গালাগালি দিচ্ছি ?

দেবদ্যুতি জ্বলে উঠল।

না না গালাগালি দিবি কেন, মিষ্টি কথাইতো বলচিস সেই থেকে।

আমি জবাব দিলুম।

তোর কি নিজের কোনো কর্তব্য নেই?

দেবদ্যুতি প্রশ্ন করল।

বললুম ঃ সকলের কাছে সমান বলে কেউই তা দেখতে পাসনে।

পর্দা ঠেলে বেয়ারা ভেতরে আসছিল। তার হাতে খাবারের ট্রে।

বললুম ঃ দাঁড়া দাঁড়া। এবারে সৎকাজে মন দেওয়া যাক।

দুঃখ করে দেবদ্যুতি বলল ঃ তুই যে এতবড় একটা—

সিঙ্গাড়ার প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বললুম ঃ নে, হাত বাড়া।

সকলেই হাসলেন আমাদের কাণ্ড দেখে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেবদ্যুতি বলল ঃ একটা জন্তু।

নিতা ঘরে ফিরছিল, বললুম ঃ ফ্রিজে বরফ থাকে তো তোমার ভাইটির মাথায় চাপিয়ে তাকে ঠাণ্ডা কর।

আপশোষ করে দেবদ্যুতি বলল ঃ ছোটদি, হার মেনে গেলুম এই অপদার্থটার কাছে।

বাতাসেও তার সমর্থন ছিল, বললুম ঃ বাঁচিয়েছিস।

খানিকটা চা পেটে পড়তেই ডাক্তারের পূর্ব শোক প্রকাশ পেল। বললেন ঃ সমস্ত রোগীই যদি আমার হাত ছাড়া হয়ে যায় তো ডাক্তারী করব কার কাছে?

তনু বলল ঃ দেওঘরের জন্যে যদি মন কেঁদেই থাকে তো সোজাসুজি তাই বলে ফেল না।

ডাক্তার বললেন ঃ কী করে যাই সবাইকে ছেড়ে?

দেবদ্যুতি বলল ঃ আমার ব্যবসাও বোধ হয় ডুবে গেছে। এখন কতটা জলের তলায়, ফিরে গিয়ে তা টের পাব।

বললুম ঃ কবে ফিরচিস ?

যবে তুই তৈরি হয়ে নিবি।

দেবদ্যুতি উত্তর দিল।

রঞ্জন আপত্তি করে বলল ঃ বিশ্বপতির আরও কয়েকটা দিন এখানে থাকা দরকার। খবর পেয়েচি, চাকরিটা বোধহয় হবে।

রঞ্জন আমার কাছেও গোপন রেখে ছিল এই খবরটুকু। শুনে খুশি হলেন সবাই।

নিতা বলল ঃ আমারও এবারে ফেরা দরকার। অনেক দিন ফাঁকি দিয়ে ফেলেচি।

হঠাৎ একটা থম থমে ভাব নেমে এল ঘরের ভেতর। আকস্মিক ভূমিকম্পের নিস্তব্ধ ভূমিকার মত একটা আসন্ন বিচ্ছেদের সূচনায় সকলের মন হঠাৎ ভারাক্রান্ত হল। নতুন কথা এল না কারও মুখে।

বাইরের সিঁড়ির ওপর এক জোড়া লঘু পায়ের শব্দ উঠল। সবারই কান গেল সেদিকে। কিন্তু ওঠবার তাড়া দেখলুম না কারও। খানিক পরেই মিসেস মুখার্জি এলেন ব্যস্তভাবে। একসঙ্গে আমাদের সবাইকে দেখবার আশা তিনি করেননি। দেখে অপ্রস্তুত হলেন না।

তনু একটা প্রাণহীন অভ্যর্থনার অভিনয় করে বলল ঃ আসুন মাসিমা, সন্ধ্যেবেলায় আপনার কাছেই যাব ভাবছিলাম।

মাসিমা বললেন ঃ তোমরা এসেচ খবর পেয়েই এলুম। কালই আমরা ফিরে যাচ্চি।

আশ্চর্য হয়ে তনু বলল ঃ ফিরে যাচ্চেন ? মিলু কোথায় মাসিমা

তার আর বেরুবার মতো মনের অবস্থা নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাসিমা উত্তর দিলেন।

এমনটি বুঝি তনু আশা করেনি, বলল কী হল তার?

আমার দিকে চেয়ে মাসিমা বললেন: আপনার বন্ধু নির্মাল্য যে এত নীচ আমরা তা স্বপ্নেও ভাবিনি। বিয়ের সব কিছু ঠিক হয়ে যাবার পর হঠাৎ আজ সে খবর পাঠিয়েচে, যে অনিবার্য কারণে বিয়ের কনে তাকে বদল করতে হল। তার মা কোন এক জমিদারের মেয়েকে ঘরে আনবার অঙ্গীকার করেছিলেন বহুদিন আগে। সামনের অঘ্রানে সে তাকেই বিয়ে করচে। তার মায়ের ই:চ্ছের কথাটা তার আগে জানা থাকলে ব্যাপারটা অনেক সহজ ও শোভন হত।

অনেকক্ষণ থেকেই দেবদ্যুতি একটু একটু কাশতে শুরু করেছিল। এবারে রুমালখানা মুখে চেপে বিষম লাগার মতো ফেঁপে ফুলে উঠল। এক মুহূর্তে তার গৌর মুখখানা উঠল রাঙা হয়ে।

মাসিমা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন: আজ একটু তাড়া আছে তনু, এবারে উঠি।

বলে একাই বেরিয়ে গেলেন।

পাগলের মত দেবদ্যুতি আবার হেসে উঠল।

জীবনের আকাশে যে এত মেঘ এত ঝড় আছে লুকিয়ে, তা জানতাম না। একখানা ছোট্ট টেলিগ্রাম সেই সংবাদ বহন করে আনল। দৃষ্টিতে আমার সমস্ত শক্তি সংহত করেও সব ঝাপসা দেখলুম। বিশ্বাস হল না নিজের চোখকে, অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখলুম সমস্ত বিশ্বটাকে।

ডামর নামে একটা নগণ্য ষ্টেশনে দু মিনিট দাঁড়িয়েই কালকা মেল আবার চলতে শুরু করল। ইংরেজীতে ষ্টেশনের নাম দেখলুম ডানওয়ার। দুর্ঘটনা ঘটেছে এই ষ্টেশন পেরিয়েই।

গাড়িতে এক ভদ্রলোক উঠলেন। গোটা কয়েক লাল পাগড়ি-ওয়ালা লোক যে ভাবে তার খাবার বাক্স আর জলের কুঁজো ইত্যাদি তুলে দিল, তাতে তাঁকে রেলের কর্মচারী বলেই মনে হল। প্রশ্ন করে সমর্থনই পেলুম। বললেন তিনি পার্মানেণ্টওয়েয় অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইনস্পেক্টর, নাম চৌধুরী। এলাহাবাদের লোক। হেড কোয়াটার্স দানকোরে! খুর্জার পশ্চিমাঞ্চল তাঁর এলাকাধীন হলেও এখন সবাইকে এখানেই কাজ করতে হচ্ছে।

আলিগড়ের পর এই ট্রেন খুর্জাতে দাঁড়ায় বলে জানতুম। তাই এই অন্ধকার ষ্টেশন দেখে বড় বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম। সেই কথা জিজ্ঞাসা করাতে ভদ্রলোক বললেন: ঠিকই জানেন আপনি। সামনের রাস্তা এখনও খারাপ বলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কশন অর্ডার দেওয়া হচ্ছে—মন্থর গতিতে চলবার জন্যে সবুজ পত্রে কড়া নির্দেশ।

দেখবেন জায়গাটা ?

ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন।

তাঁকে অনুসরণ করে আমি বাইরে মুখ বাড়ালাম। বাইরে তখন অন্ধকার নেমেছে। তবু চমকে উঠলুম দুর্ঘটনার স্থানটি দেখে। খান-তিন চার বোগি কোচ একটা লাইনের পাশে পড়ে আছে। কোনটার ছাত উড়ে গেছে, কোনটার দেয়াল নেই, কোনটার চাকা গেছে হারিয়ে! একটা নিচু লাল হাতের ছোট সিগন্যালে এসে গাড়ি এসে দাঁড়াল। বড় বড় পেট্রম্যাক্সের আলোয় চারিদিক দিনের মতো হয়ে আছে। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আরও অনেক কিছু দেখতে পেলুম। একটা ইঞ্জিন ছিটকে পড়েছে খানিকটা দূরে। আরেকটা পঁয়ষট্টি টনের ক্রেন বড় বড় কড়া নামিয়ে ইঞ্জিনের টেনডারটা তোলবার চেষ্টা করছে। এবং বাঁদিকে ফেলে ডান দিকের একটা নতুন রাস্তায় ট্রেনটা নেমে পড়ল। অসংখ্য কুটোকাটি জিনিষপত্র ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। কোথাও রক্তের চাপের ওপর ছেঁড়া ন্যাকড়ার ওপর ভারি বাক্স, তার নিচে থেকে গোত্রহীন গন্ধ উঠছে ঘন ভাবে।

অনেকটা পথ পেরিয়ে ট্রেন আবার পুরানো লাইনে ঠেলে উঠল। সেখানেও একটা বাতি জ্বলছে, সেটা হলদে। আরও খানিকটা পথ পেরিয়ে সবুজ বাতি।

এক জায়গায় অনেকগুলো ত্রিপাল খাটানো দেখলুম। ছোট ছোট ঝোপের আশে পাশে অনেকগুলো মানুষ কাঠ পুড়িয়ে রান্না করছে। তাদের ঝিমুনি দেখে মনে হল, সারাদিন এরা খেতে

পায়নি।

দরজা থেকে ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসলুম। শরীরটা অবসন্ন মনে হল! রাগও হল দেবদ্যুতির ওপর। কী দরকার ছিল তার এই ট্রেনে চাপবার। যে পাঞ্জাব যাবে পাঞ্জাব মেলে চেপে সে সোজাই যেতে পারত। দিল্লীতে কাজ আছে বলে জেদ করে দিল্লী যাচ্ছিল। পথে এই বিপর্যয়!

হঠাৎ আজ মনে হল শৈশবের বন্ধুর বুঝি তুলনা নেই। পরিণত বয়সে কতো নতুন বন্ধুই তো পেয়েচি, কই তাদের জন্য তো মন এমন কাঁদে না। কত দীর্ঘ দিনের ব্যবধানের পর দেবদ্যুতির সাক্ষাত পেয়েছিলুম। মনে হয়েছিল, বুঝি বন্ধুত্বেও ছেদ পড়েচে। কিন্তু সে যে কতো বড় ভুল, তা আরও গভীর ভাবে বুঝতে পারছি। যে বয়সে তার সঙ্গে আমার পরিচয়, স্বার্থ কথার মানে শিখিনি সেদিন। সেই নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ বুঝি জন্মান্তরেও অক্ষয় হয়ে থাকবে। দু-চোখ আমার জলে ভরে উঠল!

শ্রীচৌধুরী বুঝি লক্ষ্য করছিলেন আমাকে। বললেন: বড় বিচলিত দেখাচ্ছে আপনাকে।

নিজেকে সংযত করে বললুম: সত্যিই তাই!

দেবদ্যুতির কথা বললুম সংক্ষেপে। সমস্ত শুনে তিনি আশ্বাস দিলেন। বললেন: খুর্জার সিভিল হাসপাতালে তাঁরা আছেন। বোধ হয় সুস্থই দেখবেন তাঁকে।

বললুম: দেবতার কাছে কখনও কিছু চাইনি। আজ সারাটা পথ তার জীবন ভিক্ষা করেছি। আমার প্রথম চাওয়া কি তাঁর কানে পৌঁছাবে না?

অনেকক্ষণ নীরবে কাটল।

কেন এমন দুর্ঘটনা ঘটে। আপনি বলতে পারেন?

শ্রীচৌধুরীকে আমি প্রশ্ন করলুম।

ভদ্রলোক বললেন: ষ্টেশনে ঘটলে বলতুম রেলের লোকই খেতে পায়না বলে।

বললুম: তার মানে?

সত্যিই তাই: ভদ্রলোক উত্তর দিলেন: একটু আগে যে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারটিকে দেখলেন ডামরে, তার কত মাইনে জানেন? পঞ্চাশ টাকা। দিনের বেলায় কাজ করবার তার অধিকার নেই, তার জন্যে আশী টাকা মাইনের বড়বাবু আছেন। এ কাজ করবে সন্ধ্যে ছটা থেকে রাত দুটো, আর রাত দুটো থেকে সন্ধ্যে ছটা। ছুটি হপ্তায় একদিন। ডামরে তার বাজার হাট নেই। ছেলের স্কুল নেই, নেই ডাক্তার ওষুধ। এসবের জন্যেই তাকে খুর্জা যেতে হবে। আর যেতে হবে তার অবসরের সময়। একই অবস্থা তার পোর্টার পয়েন্টস্‌ম্যানের। তারপর কাজ করতে করতে যদি তারা ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে দায়ী কারা? এর চেয়ে সহরের একটা কেরানী বা চাপরাশির জীবনও ভাল নয় কি? পয়সা সমান হলেও সকাল সন্ধ্যার স্বাধীনতা আছে, রাতে ঘুম আছে, আর আছে বাজার হাট স্কুল কলেজ ডাক্তার বদ্যি। বিপদের সময় আছে আত্মীয় বন্ধু।

ভদ্রলোক হারিয়ে ফেলেছিলেন নিজেকে। বললুম: কিন্তু এবারের দুর্ঘটনা তো ঠিক এই কারণে নয়।

ভদ্রলোক একথা মেনে নিলেন, বললেন: তবে তফাতও বেশি নেই। যে বারোটা লোক এই চার মাইল রাস্তা দেখাশুনো করে দূরের গ্রাম থেকে তারা আসে যায়। সারাদিনে তারা কী করে

নিজেরাই ভাল করে জানে না। আমরা তাদের কাজ দেখতে বেরই। সেও গতানুগতিক ব্যাপার। দুর্ঘটনা ঘটলে সত্যিকার কারণ খুঁজতে যাব না। বলব স্যাবটাজ, দুষ্ট লোকে রেলের ফিশ-প্লেট সরিয়েছে। আদালত চেপে ধরলে চেঁচাব, এর আগের ট্রেনটা যখন নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেছে তখন লাইন খারাপ কী করে হতে পারে?

তাঁর কথার অর্থ ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করবার আগে খুর্জা পৌঁছে গেলুম। ভদ্রলোক ওভারব্রীজ পার করে টাঙ্গা ঠিক করে দিলেন, সহরের হাসপাতাল যাবার জন্যে। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলুম।

এর পরের ঘটনাগুলো বড় তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত দেহে চার মাইল পথ অতিক্রম করেও ডাক্তারের সম্মুখে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। দেবদ্যুতির মৃত্যু সংবাদে সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেল। দরজার হাতল ধরে নিজেকে সামলে নিলুম।

যুবক ডাক্তার বললেন ঘণ্টা কয়েক পরেই ভদ্রলোকের জ্ঞান হয়েছিল। কাকে যেন খুঁজলেন নিজের চারিদিকে। তারপর দুটো ঠিকানা দিলেন। একটা আপনার আর একটা আম্বালার মিস নিমীলা মুখার্জির। মারা যাবার আগে একটা উইলও করে গেছেন, পুলিসের কাছে তা জমা আছে।

দুঃখ করে বললেন: হেড ইনজুরির কেস বড় মারাত্মক, একটা কেসও আমরা বাঁচাতে পারলুম না।

কোনো প্রশ্ন করার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। ডাক্তার নিজেই বললেন: কাল রাতে তিনি মারা গেলেন। আপনাদের তারের জবাব পেলে আমরা হয়তো শবদাহ করতুম না।

আমি ফিরে আসছিলুম। বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন: মধু কে বলতে পারেন? জ্ঞানে ও অজ্ঞানে বার বার মধু মধু বলে ডাকছিলেন।

মধু কোথায়?

আমি চমকে উঠলুম।

ডাক্তার আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। বললুম: তার চাকর।

ডাক্তার তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে কয়েক খানা ছবি দেখালেন। যাদের পরিচয় জানা যায়নি, তাদের ছবি। কী সাংঘাতিক বীভৎস সেই মুখগুলো! মানুষ বলে আর চেনা যায় না। যারা অল্প চোট পেয়ে বেঁচে আছে এখনও, তাদেরও দেখলুম। কিন্তু মধুকে পেলুম না। মধু হারিয়ে গেছে।

মরবার ঠিক আগে কী বলেছিলেন জানেন?

ডাক্তার আমাকে প্রশ্ন করলেন।

বলেছিলেন, একদিনের জন্যেও শান্তি দিলি না হতভাগা। মরেও কি আমার সঙ্গে চললি?

ডাক্তারের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল! আমি পালিয়ে গেলুম!

সারারাত কোথায় কি ভাবে কাটল মনে নেই। অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙল দেখি খুর্জার সিটি ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছি। ব্যথায় সমস্ত শরীর টন টন করছে।

নিমীলার কথা মনে এল। মীরাট হয়ে সেও হয়তো আসছে। হয়তো আসছে না। জীবনের হাটে যারা নিজের ভুলে ঠকে, সেই

ভুল স্বীকার করতে তাদের মাথা কাটা যায়! ভেবেছিলুম, নিমীলাও তার ঠকার কথা স্বীকার করবে।

কিন্তু করল না। খানিকটা পরেই সে নামল মীরাটের গাড়ি থেকে। আমার কপালে কী বিজ্ঞাপন ছিল জানি না। আমাকে দেখেই একেবারে ভেঙে পড়ল। আমি তাকে ধরতে গিয়েছিলুম, আমার দুহাতের ভেতর মুখ গুঁজে অবিশ্রান্ত ভাবে কাঁদতে লাগল! কিছু বলল না, কিছু জানতেও চাইল না।

এক সময় একটু সুস্থ হয়ে বলল: আমার যে কী ক্ষতি হল আপনি জানেন না।

আমি বজ্রাহত হয়ে গেছি! একি সেই নিমীলা! কলকাতায় বালিগঞ্জের বাড়িতে যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। দৃপ্ত গর্বিত যে মেয়েটি সেদিন দেখেছিলুম, সে তার কোন রূপ? বাইরের প্রসাধনের মত সেকি তার বাইরের রূপ? আনন্দে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলুম।

একজন পুলিসের দারোগা আমাদের খুঁজে বার করলেন। বললেন: পরিচয় না থাকলেও আপনাদের আমি চিনতে পারছি! দয়া করে একবার আমার সঙ্গে আসবেন কি?

নিমীলার সঙ্গে জিনিষপত্র ষ্টেশনে জমা করে আমরা একটা টাঙ্গায় উঠে বসলুম। ভদ্রলোক আমাকে থানায় নিয়ে এলেন। সামান্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেই উইল খানা বার করে দিলেন। জমা টাকা সবই দিয়েছে নিমীলাকে, ব্যবসা দিয়েছে আমাকে, আর মধু ও তার পরিবারকে দিয়েছে তার ইনসিওরেন্সের টাকা। নিজের শেষ কৃত্যের ব্যবস্থাও সে করে গেছে। ভারি ব্যাগটা তার পকেটে পাওয়া গিয়েছিল। তাতেই সব সম্পন্ন হয়েছে।

নিমীলা কথা কইল না একটিও। নীরবে শুধু অশ্রু বিসর্জন করে গেল।

বিকেলের দিকে সে খানিকটা সুস্থ হল। খুর্জার জংসন স্টেশনে আমরা তখন ট্রেনের অপেক্ষা করছি। ইতিমধ্যে দেহের আভরণ সে খুলে ফেলেছে, সাদা শাড়ি সরু পাড়ওলা পরেছে। তার স্নিগ্ধ সজল চোখের দিকে চেয়ে আমার কান্না পাচ্ছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিমীলা বলল: তাকে যে আর দেখতে পাব না, আমি জানতুম।

আমি আমার প্রশ্নের দৃষ্টি তুলে ধরলুম তার মুখের দিকে।

নিমীলা বলল: আমি সত্যি বলছি দাদা, টেলিগ্রামখানা পেয়েই আমি বুঝেছিলুম যে আমার জীবনটা শুরুতেই ব্যর্থ হয়ে গেল। তার ডান হাতে একটা মাদুলি ছিল। অনেকবার সে আমায় সেটা দেখিয়েছিল। বলত, মিলু, অপঘাতে মৃত্যু আমার কুষ্টিতে লেখা আছে, এই মাদুলি কি আর বাঁচাতে পারবে! আমি হাসতুম তার কথা শুনে। কুষ্টি ঠিকুজীর কথায় আমার এতটুকু বিশ্বাস ছিল না।

মনে পড়ল, এই মাদুলির কথা যেন আমাকেও সে একবার বলেছিল।

নিমীলা থামল না, বলল: আজ যদি আমি বিধবা হতুম, তোমরা সবাই আমাকে সহানুভূতি জানাতে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুটাই কি মেয়েদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি?

গভীরভাবে নিমীলা কী ভাবতে লাগল। বলল: নারায়ণ শিলার সামনে গাঁটছাড়া বাঁধলেই শুধু বিয়ে হয় না। মনের মিলই

তো সত্যিকার বিবাহ। সে বিয়ে আমাদের হয়েছিল। আমিও আজ বিধবা হলুম।

নিমীলার গাল বেয়ে আবার দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

স্বামীর মৃত্যু না হলে কি মেয়েরা বিধবা হয় না?

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পর নিমীলা হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করে বসল।

এমন অদ্ভুত কথা আমি আগে কখনো শুনিনি। উত্তর না দিয়ে তাকে জবাব দেবার অবকাশ দিলুম।

ভাবতে ভাবতে নিমীলা বলল: মনের মিলই যদি সত্যিকার বিবাহ হয় তো মন ভাঙলেই তো বিবাহের বিচ্ছেদ হল! সেই ভাঙা মন নিয়ে স্বামীর ঘর করার চেষ্টা কি বৈধব্যের চেয়ে সুখের হবে? স্বামীর মৃত্যু হলে তো দ্বিতীয়বার বিয়ে করা চলে। কিন্তু বিয়ে করেও যে মেয়ে স্বামীর মন পেলে না, কিম্বা পেয়েও হারাল, সে তো বিধবা!

আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম তার চিন্তাধারা দেখে। এসব কথা সে কোথায় শিখল? তার বিলিতি বইএ, না বিলিতি শিক্ষায়?

আমার এক বন্ধু কী বলত জানো দাদা?

নিমীলা হঠাৎ প্রশ্ন করল।

আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

নিমীলা বলল: বলত, কখনো কাউকে জুতো মারার প্রয়োজন হলে জুতো জোড়াকে সিল্কের কাপড় দিয়ে মুড়ে মেরো। ও আমাকে সিল্কের কাপড়-মোড়া জুতো মেরে গেল।

বলেই আবার কেঁদে ফেলল।

গাড়িতে তুলে দেবার সময় নিমীলা আমার পায়ের ধুলো নিল।

বলল : আশীর্বাদ কর দাদা, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত যেন নিজের জীবন দিয়ে করে যেতে পারি।

প্রাণভরে আমি তাকে আশীর্বাদ করলুম।

দিন কয়েক পরে কল্‌কাতায় তার একখানা চিঠি পেলুম। লিখেছে : দাদা, আমার বাঁচবার পথ আমি খুঁজে পেয়েছি। সে শুধু টাকাই আমায় দিয়ে যায়নি। দৃষ্টিও দিয়েছে। আমি নিজেই আমার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারব।

ভেবেছিলুম মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান খুলব। মেয়েরা ঘর বাঁধার শিক্ষা পাবে সেখানে। পরে ভেবে দেখলুম, এদেশে তার প্রয়োজন নেই।

এবারে একটা আশ্রম খোলার সংকল্প করেছি। সত্যকার দুঃস্থ যারা, তাদের সেবার আশ্রম। অশক্ত রোগগ্রস্ত লোকে দেশ আমাদের ভরে আছে। পরমুখাপেক্ষী তারা, পরের দয়ার উপরেই কোনরকমে বেঁচে আছে। আমি তাদের সসম্মানে বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা করব। যে যা পারে, সে তাই করবে। নিজেদের উপার্জনের পয়সায় তারা খাবে। আমার বিশ্বাস হয়েছে, যে সামান্য কিছু সাহায্য পেলে সকলেই মানুষ হয়ে বাঁচবার অধিকার পাবে।

এ কাজে তোমার সাহায্য পাব কি দাদা ?

ফেরত ডাকে আমি তার জবাব লিখে পাঠালুম। লিখলুম, দেবদ্যুতির কারখানার সমস্ত আয় আমি তার আশ্রমে দেব !

সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত্তটি আমার মনে পড়চে।

তোমার উদয় হল আমার চোখের সামনে।

যেন ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন।

যেন পবিত্রতমা মায়াবিনী দেবদূতী।

একগাল হেসে তনু বলল: সেটা কি তোমার উজ্জ্বল মুহূর্ত বিশুদা?

নিজের বিয়েতে নির্মাল্য যাদের সহর থেকে টেনে এনেছিল, একে একে তারা সবাই ফিরে চলেছে। যারা আগে ফিরে গেছে এবং যারা পরে যাবে, তাদের আমার প্রয়োজন নেই। আজ যারা এই ট্রেনের কামরার ভেতর একসঙ্গে ফিরে চলেছি, কেবল তাদের নিয়েই এ গল্প শেষ হতে পারে।

নির্মাল্য বলল: রঞ্জনবাবু ইচ্ছে করলে আর কটা দিন থেকে যেতে পারতেন।

নিতা বলল: আর আপনিও ইচ্ছে করলে নতুন বৌদিকে সঙ্গে আনতে পারতেন।

নির্মাল্য বলল: তা পারতুম, কিন্তু সেটা জুলুম হত। বিয়ের পরে নতুন জীবনে অভ্যস্থ হবার জন্য মেয়েদের কিছু সময় দেয়া দরকার।

কতকটা আপত্তির সুরে তনু বলল: তুমি তরল জিনিষের

সঙ্গে মেয়েদের তুলনা করতে পার। পেয়ালায় রাখো পেয়ালার আকার, গেলাসে ঢাললে গেলাস।

নিতা কী ভাবছিল সেই জানে, হঠাৎ বলে উঠল : আজ একটা অন্যায় করে ফেলেচি নির্মাল্যদা। আপনার অনুমতি না নিয়ে সেই কথাটা প্রকাশ করে দিয়েচি। আজ সকালবেলা আপনার হাল্কা স্বভাবের কথা উঠে পড়েছিল। আমি চুপ করেই থাকতুম, যেমন এতদিন আছি। কিন্তু মাসিমা যখন নতুন বৌদির সামনেই সেটা সমর্থন করলেন, আমি সব প্রকাশ করে দিলুম।

কথার মোড় ফেরাবার জন্য নির্মাল্য বলল : মধুর কোন খবর পেলেন বিশুবাবু ?

মধুর খবর যে পাওয়া যায়নি, তা নির্মাল্যও জানে। তাই জবাব না দিয়েই নিতাকে বলবার অবকাশ দিলুম।

নিতা বলল : সত্যি বৌদি আমিই নির্মাল্যদাকে এই অনুরোধ করেছিলাম। আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

ব্যস্তভাবে নির্মাল্য বলতে লাগল : সেই থেকে নিয়মিত আমি কাগজ দেখে যাচ্ছি, মধুর নাম আজও দেখলুম না।

নিতা নিজের কথাই বলতে লাগল : তারপর যখন মিনুকে দেখলাম, বললাম, এখন মেয়ে পছন্দ হবে না আপনার !

নির্মাল্য বলল : কম দিন তো হল না দুর্ঘটনার, মাস তিনেক হল নিশ্চয়ই। তাই না বিশুবাবু ?

আমরা সবাই চুপ করে আছি।

নিতা বলল : নির্মাল্যদা জবাব দিলেন, তোমাকে যদি না পাই তো বিয়ের তাড়া কিসের ? মা বাবাই সে ব্যবস্থা করতে পারবেন।

নির্মাল্য আমাকে প্রশ্ন করল: কলেজের চাকরি তো আপনার হয়ে গেল, চূণের কারবারটা তাহলে কে দেখবে?

নিতা বলল: আমি বললাম, লোকে সন্দেহ করবে, আমি হয়তো গোলমাল পাকিয়েছি। বাধা দিয়ে নির্মাল্যদা বললেন, তোমাকে সন্দেহ করবে কী! আমি পুরুষ মানুষ, না আমাদের চরিত্রে কোন দৃঢ়তা আছে!

অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তনু এ গল্প শুনছিল। আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলল: এ আলোচনা তোমাদের কবে হল?

সহজভাবে নিতা বলল: তোমার হয়তো মনে আছে, যেদিন মিলুরা প্রথম আসে, আমি সেদিন নির্মাল্যদার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

এবারে চেঁচামেচি শুরু করল নির্মাল্য। বলল: যত সব বাজে গল্প, এত বকতেও পারে নিতা!

আমার বলবার কিছু নেই। পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে আজ নির্মাল্যকে দেখলুম। হৃদয়ের পরম ত্যাগ দিয়ে প্রেমের পূজা করেছে এই নির্বিকার লোকটা। কারও কাছে এতটুকু সম্মানের প্রত্যাশা রাখেনি। মনে মনে তাকে প্রণাম করলুম।

খানিকক্ষণ নীরবে কাটল।

অ্যাটাচি কেস থেকে একখানা বই বার করলুম। কিন্তু নামটা দেখেই মন খারাপ হয়ে গেল। তাড়াতাড়িতে একখানা পড়া বই এনে ফেলেচি।

ওপাশ থেকে নিতা ধমক দিয়ে উঠল, বলল: কি যে ছাই সারাক্ষণ বই মুখে করে থাকতে ভালবাসেন!

বললুম: তোমাদের গল্পও তো সব শুনছি।

দেখি কী বই ওটা ?

বলে তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল। আমি এগিয়ে দিলুম।

খানিক্ষণ নাড়াচাড়া করে বলল : তার চেয়ে একটা কবিতা বাঙলা করে শোনানো চলে। শুনে আমরাও ধন্য হতে পারি।

বইএর শেষ দিকে কয়েকটি কবিতা ছিল। বোধহয় সে তা দেখেছে।

বললুম : তাই শোনাচ্ছি।

প্রথম যে কবিতাটি নজরে পড়ল, তার বাঙলা তর্জমা এই রকম :

সেই উজ্জ্বল মূহূর্তটি আমার মনে পড়চে।

তোমার উদয় হল আমার চোখের সামনে।

যেন ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন,

যেন পবিত্রতমা মায়াবিনী দেবদূতী।

একগাল হেসে তনু বলল, সেটা কি তোমার উজ্জ্বল মুহূর্ত বিশুদা ?

ইঙ্গিতটা বড়ই স্পষ্ট। নিতা মাথা নিচু করল। আমার মুখে আজ একথার উত্তর যোগাল না।

একটা বড় ষ্টেশনে ট্রেন থামছিল। নির্মাল্য লাফিয়ে নেমে গেল এবং খানিকক্ষণ পরেই উপাহার গৃহের একজন লোকের হাতে বিস্কুট পেষ্ট প্রভৃতি কিছু শুকনো খাদ্য তুলে দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। চায়ের ট্রেটা আমার দিকে এগিয়ে বলল : সেই উজ্জ্বল মুহূর্তটি তোমাদের চিরন্তন হোক !

সমাপ্ত